الأمور البدعية المروجة باسم العبادة

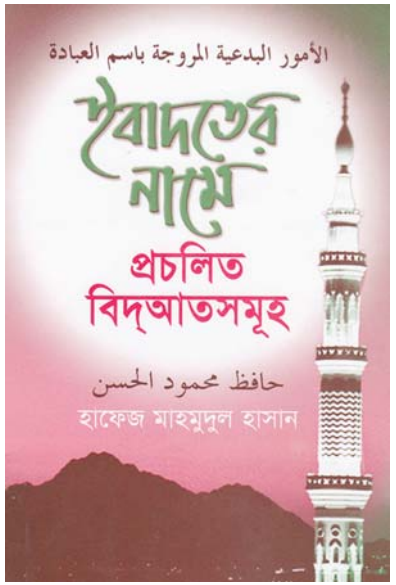

Bev`‡Zi bv‡g
cPwjZ KwZcq we`AvZ
nv‡dR gvng`j nvmvb

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين

وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين- اما بعد-

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জীন ও ইনসানকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা কিভাবে ইবাদত করবে, সে পদ্ধতি শেখানোর জন্য আদম (আঃ) থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসুল এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাদের কারো কারো উপর আসমানী কিতাব ও সহীফা অবতীর্ণ করেছেন। ইবাদতের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর আলোচনা-সমাধান এতে স্থান পেয়েছে। নবীদের আগমন ও আসমানী কিতাবের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনুল কারীম সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তায়ালা এ কিতাব এবং তার প্রিয় নবীর মাধ্যমে তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টির উদেশ্য সাধন তথা ইবাদতের জন্য যা যা দরকার, কোরআন এবং সুন্নাহতে তা সবিস্তারে মূলনীতিসহ বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ-

"আর আমি আপনার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছি, যা দ্বীনের প্রতিটি বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনাকারী, আর বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য মহা হেদায়াত, বিরাট রহমত ও সুসংবাদ জ্ঞাপক।" (নাহল ঃ ৮৯)

অন্য আয়াতে এসেছে ঃ

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ-

"আমি কিতাবে কোন কিছুই ছাড়িনি (সব কিছুর বর্ণনা করেছি)।" (আনআমঃ ৩৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম বলেন,

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله-

"তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যাবত তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি রাসূলের সুন্নাত" (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং হাদীসের মর্মানুযায়ী এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে-ইবাদতের ক্ষেত্রে দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে সুন্নাহ-বিমুখ কতিপয় লোক ইবাদতের নামে এমন সব নতুন বিষয় আবিষ্কার করেছে যার সাথে দ্বীনের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। প্রত্যেক হক প্রত্যাশী, সুন্নতের অনুসারী ঈমানদারের এ জাতীয় বিদ্আত থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য।

বিদ্আত কবীরা গুনাহের চেয়েও নিকৃষ্ট। শয়তান বিদ্আতী কার্যক্রমে কবীরা গুনাহর চাইতেও বেশী খুশী হয়। কারণ কবীরা গুনাহকারী যখন গুনাহে লিপ্ত হয় তখন জানে, এটা গুনাহের কাজ। ফলে এ কাজ থেকে তার তওবা নসীব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বিদ্আতকারী যখন বিদআতে লিপ্ত হয় তখন সে এ বিশ্বাসের উপরই থাকে যে- তার এ কাজ দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে। ফলে তার আর তাওবা নসীব হয়না।

আজ আমাদের মুসলিম সমাজের দিকে তাকালে এর করুণ চিত্র আমাদের সম্মুখে নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। আমলী জিন্দেগীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদআত এমন ভয়ংকর ভাবে তার রাহু বিস্তার করে রেখেছে যে-সুন্নাতের স্বচ্ছ আলোকধারায় আবগাহন করে মুসলিম জীবনকে সমুদ্ভাসিত করাটা যেন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অনেকেই না জেনে, অজ্ঞতাবশতঃ সুন্নাত এবং সাওয়াবের কাজ ভেবে এগুলো করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের সামনে বিদআতের পরিচয়, এর ভয়াবহতা এবং দেশে প্রচলিত বিদআত সমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরার আবশ্যকীয়তা উপলব্ধি করে এমহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করছি। রাব্বুল আলামীনের কাছে তাওফীক কামনা করছি, তিনি যেন বিশুদ্ধ কথাগুলো কলমে এনে দেন। বিদআতের মূল্যোৎপাটন করে সুন্নাতের পথ সমুন্নত করেন। আমীন।

we`AvZ-Gi cwiPq t

বিদআত এর শাব্দিক অর্থঃ বিদআত (بدعة) শব্দটি আরবী। ب- د- ع- মূলধাতু থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ হচ্ছেঃ

اختراع الشئ واحداثه على غير مثال سابق سواء كان محمودًا او مذموماً-

"পূর্ব নমুনা ব্যতীত ভালো বা মন্দ নতুন কোন বিষয় বা বস্তু বানানো বা আবিষ্কার করা"।

পূর্বে কোন দৃষ্টান্ত নেই এমন জিনিসকে শুরু করা বা নির্মাণ করার অর্থেও بدع শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কোরআনে بدعة শব্দটির ব্যবহার এসেছে এভাবে

قل ماكنت بدعا من الرسل হে রাসূল! আপনি বলুন! আমি তো রাসূলদের মধ্যে নুতন কোন রাসূল নই। (সূরা আহকাফ ঃ ০৯)

ورهبانية ابتدعوها- আর বৈরাগ্যতা যাকে তারা নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

بديع السموات والارض - (তিনি আল্লাহ) আসমান এবং জমিনের উদ্ভাবক স্রষ্টা। (সূরা বাকারা ঃ ১১৭)

আয়াতগুলোতে নুতন আবিষ্কার করা, পূর্ব নমূনা ছাড়া সৃষ্টি করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

الانقطاع বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, الكلال ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে থেমে যাওয়ার অর্থও এতে রয়েছে। এ অর্থের আলোকেই উট যখন দুর্বলতা, অসুস্থতা বা ক্লান্তিজনিত কারণে পথে বসে পড়ে বা কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন আরবরা বলে أبدعت الابل (لسان العرب مادة بدع (৮/৬-৭)

আর হাদীসে এসেছে انى أبدع فاحملنى (مسلم ১০৯৬/৩)

"(বাহন হালাক হয়ে যাবার কারণে) আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। অতএব আমাকে বহন করে নিয়ে চল"।

বিদআতের সাথে শেষোক্ত অর্থদ্বয়ের সম্পর্ক হচ্ছেঃ ক্লান্তির কারণে উটের পথে বসে পড়া যেমন স্বাভাবিক চলমান অবস্থার পরিপন্থি বিচ্ছিন্ন একটি অবস্থা তেমনি বিদআত ও সিরাতুল মুস্তাকিমের পরিপন্থী সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন, নব আবিস্কৃত অস্বাভাবিক একটি অবস্থা। উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে- নতুন আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা, শুরু করা, বানানো, থেমে যাওয়া, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি অবস্থার নাম হচ্ছে বিদআত (بدعة)

kixq‡Zi cwifvIvq we`AvZ t

ওলামায়ে কেরাম বিদআতের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ

البدعة تطلق على كل ما أحدث فى الدين مما لا اصل له فى الشرع-

"দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিস্কৃত প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বিদআত বলা হয় শরীয়তে যার কোন মূলনীতি বিদ্যমান নেই। محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع- (ص : ২৯৮)

◈ ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেনঃ

ان البدعة فى الدين هى مالم يشرعه الله ورسوله-

"যে জিনিসকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল বিধিবদ্ধ করেননি সেটিই দ্বীনের মধ্যে বিদআতরূপে গণ্য হবে।" (মাজমু আল- ফাতাওয়া, ৪/১০৭-১০৮)

◈ المدخل لدراسة العقيدة এর গ্রন্থকার ডাঃ ইবরাহীম আল বুরাইকান বলেনঃ

البدعة كل ما أحدث فى الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب-

"আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পর দ্বীনের মধ্যে নতুন যা কিছু আবিস্কৃত হয়েছে তাই বিদআত।"

এখানে بقصد التقرب তথা "আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে" কথাটি বলায় দুনিয়াবী নতুন আবিস্কৃত বস্তুসমূহ বাদ পড়েছে।

◈ আল্লমা ইবনু রজব বলেন,

المراد بالبدعة: ماالحدث ممالا أصل له فى الشريعة يدل عليه-

" বিদআত বলতে এমন প্রত্যেক কাজকে বুঝায় যার সমর্থনে শরীয়তের কোন মূলনীতি নেই।" (جامع العلوم والحكم- ص ২৩৩)

ইমাম নববী (রঃ) বলেন ঃ البدعة كل شئ عمل على غير مثال سابق-

"প্রত্যেক ঐ জিনিস যা পূর্ব নমূনা ছাড়া বানানো হয়েছে তাই বিদআত।"

◈শাহ মোঃ ইসমাইল শহীদ বলেন ঃ البدعة كل فعل اوقول اوعقيدة لم يثبت من النبى صلى الله عليه وسلم ولم يأمربه أحدا، ولم يقرر عليه أحدا وكذالك ماكان رائجافى عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم ولم يقرروا عليه أحدا، ولا يوجدله نظير فى هذه العهود الاربعة ولايثبت بالاجتهاد، بل انما اخترعها الناس بعد هذه العهود الاربعة وحسبوا أن فى فعله ثوابا وفى تركه عقابا-

"প্রত্যেক কথা কাজ ও বিশ্বাস যা রাসূল (সাঃ) থেকে প্রমাণিত নয় এবং তিনি এ বিষয়ে কাউকে নির্দেশ ও দেননি, কাউকে ঐ কাজের উপর সমর্থন ও প্রদান করেননি উহাই বিদআত। এমনিভাবে যা সাহাবা তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এর যুগে চালু ছিলনা, তারা এর উপর কাউকে সমর্থন ও দেননি, এ চার যুগে এর কোন নযীর ও ছিলনা, এবং ইজতেহাদের দ্বারাও তা প্রমাণিত হয়নি বরং কতিপয় লোক পরবর্তিতে এগুলোকে আবিষ্কার করেছে এবং এ ধারনা করেছে যে এগুলো করার মধ্যে সাওয়াব আর না করার মধ্যে গুনাহ রয়েছে। মূলতঃ এটিই হচ্ছে বিদআত।"৮৩ تقوية الايمان ص

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে- এমন বিষয়সমূহ যা রাসূল (সাঃ) অথবা সাহাবাগণের যুগে দ্বীন ও সাওয়াবের কাজ হিসেবে প্রচলিত ছিলনা, শরীয়তের মূল উৎসসমূহ তথা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াসে যার কোন ভিত্তি ও মৌলিক সমর্থন নেই, ভাল ও সওয়াবের কাজ মনে করে মনগড়া সে ইবাদতের নামই হল বিদআত।

সাথে সাথে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে- ব্যবহারিক জীবনের কাজকর্মে এবং বৈষয়িক জীবন-যাপনের জন্য নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন ও নব আবিস্কৃত যন্ত্রপাতি নির্মাণের সঙ্গে শরীয়তি বিদআতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, এগুলো ইবাদত হিসেবে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয়না। এখানে আর একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, তা হলো-রাসূলের যমানায় যে কাজ করার প্রয়োজন হয়নি, পরবর্তীকালে দ্বীনি কোন লক্ষ্য অর্জনে যদি তা করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সেটা বিদআত হবেনা। যেমন-প্রচলিত নিয়মে মাদ্রাসা শিক্ষা, প্রচারমূলক দ্বীনি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, কোরআন হাদীস বোঝার জন্য আরবী ব্যাকরণ রচনা-ইসলাম বিরোধীদের জবাব দেওয়ার জন্য আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি, যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষাদান, দ্রুতগামী ও সুবিধাজনক যানবাহন নির্মাণ-যদিও এগুলো রাসূল ও সাহাবাদের যুগে বর্তমান রূপে প্রচলিত হয়নি, তা সত্ত্বেও এগুলোকে বিদআত বলা যাবে না। কারণ, এগুলোর স্বপক্ষে কোরআন সুন্নায় নীতি নির্ধারণমূলক বক্তব্য রয়েছে। অতএব এগুলো সুন্নাহভিত্তিক শরীয়ত সম্মত পূণ্যকাজের অন্তর্ভূক্ত। রাসূল যা করেননি , করতে বলেননি , মৌন সম্মতি প্রদান করেননি এবং শরীয়তে যার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়না, সেটিই বিদআত।

(দেখুনঃ মাওঃ আবদুর রহীমের সুন্নাত ও বেদআত, পৃঃ ১৫-১৬)

উদাহরণে মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করা যায়-

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة- الانفال- ৬০

"কাফিরদের মোকাবিলা করার জন্য সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় কর।" এ আয়াতে শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর রাসূল (সাঃ) قوة শক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ জেনে রেখো الاان القوة الرمى শক্তি হচ্ছে ঃ ক্ষেপনাস্ত্র। রাসূলের যুগে ক্ষেপনাস্ত্র ছিল তীর, বর্শা, বল্লম, পাথর ইত্যাদি। আর বর্তমানে আধুনিক যুগে এ্যাটম বোমা, কামান, পেট্রিয়ট ক্ষেপনাস্ত্র এ স্থান দখল করেছে। এখন আধুনিক এ যন্ত্র গুলোকে বেদআত বলার কোন সুযোগ নেই, কারণ মূলনীতি বা আসল নির্দেশ রাসূলের মুখ থেকেই পাওয়া গেছে। সুতরাং যুগে যুগে কিয়ামত পর্যন্ত যত অত্যাধুনিক ক্ষেপনাস্ত্র আবিস্কৃত হবে সবই কোরানের নির্দেশ এবং রাসূলের ব্যাখার মধ্যে শামিল হয়ে যাবে, অতএব এটি বিদআত নয়। বরং শরীয়ত সম্মত সুন্নাত।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ بلغوا عنى ولو اية-
"আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও, যদি একটি আয়াত ও হয়না কেন।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ - طلب العم فريضة على كل مسلم
"প্রতিটি মুসলমানের উপর জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ।"
উপরোক্ত হাদীস দ্বয়ে আমরা পৌঁছানোর এবং জ্ঞান অন্বেষনের নির্দেশ লাভ করলাম। রাসূলের এবং সাহাবাদের সময়ে পৌঁছানোর পদ্ধতি ছিল, সাহাবারা পায়ে হেটে, উটের পিঠে চড়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে গিয়ে একাজ আঞ্জাম দিতেন। মসজিদে মসজিদে দারসের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা করা হতো। মসজিদই মাদ্রাসার ভূমিকা পালন করতো। তিনটি মাদ্রাসা তথা মসজিদ সে সময়ে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল।

مدرسة عبد الله بن عباس بمكة ، مدرسة عبد الله بن مسعود بالكوفة، مدرسة ابي بن كعب بالمدينة- মক্কায় মসজিদে হারামে ইবনে আব্বাসের মাদ্রাসা, মসজিদে নববীতে উবাই ইবনে কাবের মাদ্রাসা, আর কুফার জামে মসজিদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মাদ্রাসা।

যুগের পরিবর্তন ও উন্নতির সাথে সাথে পৌঁছানো এবং জ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতিতে ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আলাদা শিক্ষাংগনের পাশাপাশি ইন্টারনেট এবং মোবাইলের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর একস্থান থেকে অন্য স্থানে জ্ঞানের আদান-প্রদান করা হচ্ছে। আমরা কি এ প্রযুক্তি গ্রহণকে বিদআত বলব? কখনো নয়। কারণ, মূলনীতি এবং নির্দেশ তো রাসূল (সাঃ) থেকেই আমরা পেয়েছি। মোদ্দাকথা, কাজটির স্বপক্ষে যদি শরীয়তের দলীল পাওয়া যায় তাহলে সেটি আর বিদআত থাকে না।

kixq‡Zi `wó‡Z we`Av‡Zi ûKg t

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওহী তথা কোরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে এ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেনঃ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُم الاسْلاَمُ دِيْنًا-

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতরাজি সম্পূর্ণ করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" (আল-মায়েদা ঃ৩)।

যে জিনিস পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সেখানে বৃদ্ধি করার কোন প্রয়োজন পড়েনা, আবার কিছু কমিয়ে ফেলার অবকাশ ও থাকেনা। যেমন একটি গ্লাসকে যদি আপনি পানি দিয়ে সম্পূর্ণ ভরে দেন, তাহলে এর মধ্যে আর

এক ফোটা পানিও রাখতে পারবেন না। রাখতে চাইলে যতটুকু রাখবেন, ততটুকু আগের থেকে ফেলে দিলেই কেবল রাখতে পারবেন। আল্লাহ যখন দ্বীনের এ পাত্রকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তখন এর মধ্যে অন্য কোন কিছু রাখা সম্ভব নহে। রাখতে গেলেই অপূর্ণাঙ্গতা দেখা দেবে।

রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে ওহীর আলোকে যাবতীয় দ্বীনি বিষয় সুচারুরূপে সম্পাদন করে গেছেন। অতত্রব এখানে আর কোন বিদআতের বৈধতা কল্পনা করা যায় না। এ জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআত সম্পূর্ণ হারাম। নতুন কিছু যোগ করার সুযোগ কারো জন্যই রাখা হয়নি। কোরান এবং হাদীসের মাধ্যমে রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন, দুনিয়া এবং আখেরাতে সফলতা লাভের জন্য তা আকড়ে ধরাই যথেষ্ট। এর বিরুদ্ধাচরণ বা এতে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধির অধিকার কারো নেই। কোরান, হাদীস ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে।
নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি পেশ করা হল ঃ

KiAvb t_‡K t

আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ-

" হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তা থেকে কখনো বিমুখ হয়ো না, অথচ তোমরা শুনছ" (আনফাল ঃ ২০)।

সূরা মুহাম্মদ- এর ২৩ নং আয়াতে এসেছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের পূণ্য কাজগুলোকে (বেদাতের কারণে) বাতিল করে দিও না।"

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ ترْحَمُوْنَ-

"আর তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর তাহলেই তোমাদের প্রতি রহম করা হবে।"

এমনিভাবে সূরা আহযাবের ৭৬ নং আয়াত ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

"যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তাঁরাই বড় ধরণের সফলতা লাভ করবে।"

সূরা নিসার ৫৮নং আয়াত ঃ

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا أَطِيْعُو اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنَازَعْتمْ فِى شَىءٍ فَرُدُّوْهُ الَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتمْ تؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদেরও। এরপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ কর, তাহলে বিষয়টিকে আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে ফেরাও, যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাসী হও। এটিই উত্তম এবং পরিণামের দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট।"

বর্ণিত আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে- হেদায়েত, রহমত, বড় ধরণের সফলতা, অফুরন্ত নেয়ামতে ভরপুর চিরস্থায়ী জান্নাতে সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট ফল লাভের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র তাঁর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং-কোরান-সুন্নাহ থেকে সরে গিয়ে বিদআতের দিকে ধাবিত হয়ে সেটাকে গ্রহণ করার কোন সুযোগ কি কারো আছে?

আল্লাহ তায়ালা রাসূলের জীবনাদর্শকে সর্বোত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (আল-আহযাব ঃ ২১) ।

রাসূল যা দিয়েছেন তাকে গ্রহণ আর যা নিষেধ করেছেন তা বর্জনের হুকুম সম্বলিত আয়াতে বলা হচ্ছে ঃ

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا-

"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (হাশর ঃ ৭) ।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ফায়সালাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে না নিলে ঈমানদার হওয়া যায় না। তাইতো কোরআনে এসেছে ঃ

فَلاَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِى اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

"হে রাসূল আপনার রবের শপথ! তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের বিবাদের বিষয়ে আপনার দ্বারা মীমাংসা না করায় এবং আপনার ফায়সালায় অন্তরে কোন অস্বস্তি বোধ না করে এবং পূর্ণরূপে মেনে না নেয়।" (নিসা ঃ ৬৫) ।

সূরা আহযাবের ৩৬নং আয়াতে এসেছে ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهَ وَرَسُوْلُه أَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ-

"কোন ঈমাদার পুরুষ বা মহিলার জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়সালা দেয়ার পর তাতে তাদের নিজস্ব মত বা এখতিয়ার থাকবে।"

রাসূলের আনুগত্য করলেই আল্লাহর আনুগত্য হয়। নইলে নয়। সূরা নিসার ৮০নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلى فَمَا اَرسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيْظًا-

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি বিমুখ থাকল (হে রাসূল তাতে আপনার কি)আমি আপনাকে তাদের প্রতি-রক্ষকরূপে পাঠাইনি।"

রাসূলই একমাত্র সঠিক পথের দিশা দিতে পারেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِى اِلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ صِرَاطِ اللهِ-

"আর নিশ্চিতভাবে আপনিই সিরাতের মুস্তাকীম তথা আল্লাহর রাস্তার দিশা দিতে পারেন।" (আশ-শূরা ঃ ৫২-৫৩) ।

যারা রাসূলের বিরোধিতা করবে, তার নির্দেশ অমান্য করবে, তাদেরকে সর্তক করে দিয়ে কোরানে এসেছে ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تصِيْبَهُمْ فِتنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمَ-

"যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা এ বিষয়ে সর্তক হয়ে যাক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (সূরা আন-নূর ঃ ৬৩)

অনুসরণের ক্ষেত্রে রাসূলের পাশাপাশি সাহাবারাও অনুসরণযোগ্য। এজন্য সূরা তাওবাহ এর শততম আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتبَعُوْهُم بِاحْسَانٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ-

"আর মোহাজির-আনসারদের মধ্যে (ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে) অধিক অগ্রগামী এবং (অবশিষ্ট উম্মতের মধ্যে) যে সকল লোক নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুগামী হল, তাদের সকলের উপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।"

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত বিষয়গুলো হল-সর্বোত্তম আদর্শ রাসূলের আদর্শ, কেবলমাত্র তারই নির্দেশিত পথ গ্রহণ করতে হবে এবং নিষিদ্ধটাকে ছাড়তে হবে। আল্লাহ এবং রাসূলের মতের বাইরে কোন নিজস্ব মত থাকতে পারবেনা। রাসূলই একমাত্র পারেন আল্লাহর পথ তথা সঠিক পথ দেখাতে। যারা রাসূলের বিরোধিতা করবে তারা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও অনুসরণযোগ্য।

অতএব, দ্বীনের জন্য নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করার কোন প্রয়োজন নেই। কেউ এমন কিছু করার মানেই হল-(নাউযুবিল্লাহ) একথা বোঝানো যে- রাসূল দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে যেতে পারেননি। অথবা তিনি দায়িত্বে অবহেলা করেছেন, অথবা তার আদর্শ সর্বোত্তম নয়, যার কারণে সে পরবর্তীতে এসে আরো কিছু সংযোজন করেছে। এ জাতীয় ধারণা বা আচরণ স্রেফ কুফরী বৈ আর কিছু নয়।

nv`xm t_‡K t

দ্বীনের মধ্যে নতুন করে কোন কিছু সংযোজনের সুযোগ নেই, এটা যে সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ, বেদআতীদেরকে যে পরকালে মারাত্মক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, এ সম্পর্কে রাসূলের অসংখ্য হাদীস রয়েছে। নিম্নে তা থেকে অল্প কয়েকটি তুলে ধরা হল ঃ

▣ আবু দাউদ, তিরমিজি এবং মসনাদে আহমদে এসেছে ঃ

عن العرباض بن سارية (رض) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يارسول الله كانها موعظة مودع فاوصنا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة-

"হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন, অতঃপর এক জ্বালাময়ী ভাষায় আমাদেরকে উপদেশ দিলেন, যাতে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হল এবং অন্তরগুলো আবেগের অতিশয্যে বিগলিত হয়ে গেল। তখন একজন বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ তো যেন বিদায়ী উপদেশ, অতএব আমাদেরকে আরো কিছু নসিহত করুন। আল্লাহর রাসূল বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে খোদাভীতির উপদেশ দিচ্ছি, এমনিভাবে শোনার এবং আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি, এমনকি আমীর যদি কালো হাবশী গোলামও হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে আমার পর যারা জীবিত থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সে সময় তোমাদের কর্তব্য হবে

আমার সুন্নাত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধরা। একে তোমরা মজবুতভাবে ধারণ করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে তা দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধরবে। আর তোমরা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে নব আবিস্কৃত বিষয়াদি থেকে দূরে রাখবে। কেননা প্রত্যেক নব আবিস্কৃত জিনিসিই বিদআত, আর সকল বিদআতই ভ্রষ্ট।"

▣ অপর একটি হাদীসে এসেছে ঃ

أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامر محدثاتها وكل بدعة ضلالة-

"অতঃপর সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পথ। আর দ্বীনের প্রত্যেক নব আবিস্কৃত বিষয়ই মন্দ ও নিকৃষ্টতর। আর প্রত্যেক বিদআত হল ভ্রষ্ট।" (মুসলিম)।

▣ রাসূল (সাঃ) আরে বলেছেন ঃ

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهورد-

"যে কেউ আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন অবাঞ্ছিত কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম)।

▣ মুসলিম শরীফে আরেকটি বর্ণনা এসেছে ঃ

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد-

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো যা আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"

▣ ইমাম নববী (রাঃ) বলেন ঃ "বর্ণিত হাদীসটি অল্প কথায় বেশী অর্থ প্রকাশকারী ইসলামের মূল বুনিয়াদী বিষয় সম্বলিত হাদীসসমূহের একটি। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- "ধর্মে নতুন আবিস্কৃত সকল বিষয়ই অগ্রহণযোগ্য।" (সহীহ মুসলিম শরহে নববী-১২/১৬)

বেদআতীদের যে করুন অবস্থা কেয়ামতের ময়দানে হবে সে সম্পর্কে সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে এসেছে ঃ

"হাশরের ময়দানে রাসূলে কারীম (সাঃ) তাঁর উম্মতকে পেয়ালা ভরে ভরে হাওযে কাওসারের পানি পান করাবেন । লোকেরা একদিক থেকে আসতে থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে অপরদিকে সরে যেতে থাকবে। এ সময় একদল লোক "হাওযে কাওসারের" দিকে আসতে থাকবে রাসূল বলেন ঃ তখন يحال بينى وبينهم "আমার ও তাদের মাঝে এক প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। তারা আমার নিকট পৌঁছাতে পারবেনা। আমি আল্লাহর নিকট দাবী করে বলব ঃ হে আল্লাহ! এরাতো আমার উম্মত, এদের আসতে বাধা দেয়া হল কেন? তখন আল্লাহ তায়ালা জবাব দেবেন ঃ

انك لاتدرى ماأحدثوا بعدك

"এই লোকেরা তোমার মৃত্যুর পর কী কী বিদআত উদ্ভাবন করেছে তা তুমি জানো না।"

বলা হবে, انهم غيروا دينك- "এরা তো তোমার দ্বীনকে বদলে দিয়েছে। বিকৃত করেছে। (এজন্য এ বিদআতীরা কখনো হাওযে কাওসারের নিকটে হাজির হতে পারবে না।)

▣ নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ তখন আমি তাদের লক্ষ্য করে বলবো ঃ سحقاً سحقًا "দূর হও, দূর হও, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও।" (সুন্নত ও বিদআতঃ মাওঃ আবদুর রহীমঃ পৃ,২৯২)

m¤$wbZ fvB‡qiv! এ হচ্ছে বিদআতীদের শেষ পরিণতি। রাসূলের উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি, দ্বীনে বিদআতের কোন স্থান নেই।

we`AvZ m¤ú‡K KwZcq ¯bvgab¨ mvnvex Zv‡eqx I Av‡j‡gi e³e¨ t

◙ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ
ان لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام وليا من اولياءه يذب عنها وينطق بعلا متها فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله قال ابن المبارك وكفى بالله وكيلاً-

"প্রত্যেক ঐ বিদআত, যার দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্য থেকে এমন বান্দা তৈরী হয়ে যায় যে আল্লাহর পক্ষ হয়ে বিদআতকে প্রতিহত করে, এর চিহ্নাবলী মানুষদেরকে বলে দেয়। অতএব তোমরা বিদআত বিরোধী এ সকল মজলিসে উপস্থিত হওয়ার সুযোগকে গণীমত মনে কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। ইবনুল মোবারক বলেন, কার্য নির্বাহক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

◙ আবু উমাইয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ
لان أرد رجلا عن رأى سئ أحب الى من اعتكاف شهر-
"আমার নিকট একজন ভ্রান্ত মতের অনুসারী তথা বিদআতীকে তার মত থেকে ফেরানো এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও অধিক প্রিয়।"

◙ ইমাম আওযায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ
كان بعض اهل العلم يقول لا يقبل الله من ذى بدعة صلاة ولا صياماً ولا صدقة ولا جهادًا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلاً وكانت أسلافكم تشتد عليهم السنتهم وتضيق منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم-

"জ্ঞানীদের কেউ কেউ বলতেন, আল্লাহ তায়ালা কোন বিদআতীর নামায, রোজা সাদাকা, জিহাদ, হজ্ব, ওমরা, দান-খয়রাত ও ন্যায়পরতা কোন কিছুই কবুল করেন না। তোমাদের পূর্বসূরীদের ভাষা বিদআতীদের ব্যাপারে কঠোর ছিল, এদের ব্যাপারে তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যেত এবং তারা লোকদের বিদআতীদের সম্পর্ক সর্তক করতেন।"

◈ محمد بن وضاح তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ البدع والنهى عنها তে উল্লেখ করেন যে اسد بن موسى তার বন্ধু اسد بن الفرات এর কাছে লিখিত মূল্যবান এক চিঠিতে বলেছেন ঃ

wcq fvB! আপনার কাছে এ চিঠি লেখায় আগ্রহী হয়েছি এ জন্য যে, আপনার দেশে লোকেরা আপনার ভূয়সী প্রশংসা করছে। কারণ, আল্লাহ আপনাকে এমন যোগত্য দিয়েছেন যে, আপনি তাদের মাঝে ইনাসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন, রাসূলের সুন্নতকে বুলন্দ করেছেন, বিদআতীদেরকে দোষারূপ করা সহ বেশী বেশী আলোচনার মাধ্যমে তাদের কৃতকর্মের অসারতা প্রমাণ করেছেন। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে বিদআতীদেরকে অপমানিত ও পরাজিত করুন, সুন্নতের অনুসারীদের পিঠ মজবুত করে দিন। বিদআতীদের দোষ-ক্রুটি প্রকাশ ও তাদের উপর আঘাত হানতে আল্লাহ আপনাকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহ তাদেরকে অপমাণিত করুন, তারা যেন তাদের বিদআত নিয়ে আত্মগোপন করে। আর আপনি এ কাজে অফুরন্ত সাওয়াবের আশা করুন। সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত সহ আপনার অন্যান্য নেক কাজের চেয়ে এটাকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করুন। আল্লাহর কিতাবকে প্রতিষ্ঠা করা আর রাসূলের সুন্নতকে জীবিত করার

সাওয়াবের সাথে কি এগুলোর কোন তুলনা হয়? রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি আমার কোন সুন্নতকে জীবিত করবে, সে এবং আমি এভাবে জান্নাতে থাকব, একথা বলে রাসূল দু-আঙ্গুলকে একত্রিত করলেন।” রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন ঃ “যে ব্যক্তি সুন্নতের দিকে আহবান করার পর কেউ তাকে অনুসরণ করলো, অনুসরণকারীর সাওয়াবের অনুরুপ সাওয়াব আহ্বানকারী কেয়ামত পর্যন্ত পেতে থাকবে। ব্যক্তিগত আমলের দ্বারা কে এমন সাওয়াব লাভ করবে?

তিনি চিঠিতে আরো লিখেছেন ঃ (হে প্রিয় ভাই) আপনি দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, একনিষ্ঠতা সহকারে সাওয়াবের আশায় কাজ করে যান। আল্লাহ আপনার দ্বারা বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ফেতনায় নিমজ্জিত বিদআতীদের প্রতিহত করবেন, তখন আপনি আপনার নবী মুহাম্ম (সাঃ) এর প্রতিনিধিতূল্য হয়ে যাবেন। আর কিয়ামতের দিন এ আমলের সমতূল্য অন্য কোন আমল সহকারে আপনি আল্লাহর সাক্ষাৎ করবেন না (অর্থাৎ এর সাওয়াবই সকল সাওয়াবের উপরে থাকবে।) বিদআতীদের মধ্য থেকে কেউ আপনার ভাই-বন্ধু, সঙ্গী-সাথী হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কেননা বর্ণিত আছে ঃ “যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাথে উঠাবসা করে তার উপর থেকে আল্লাহর হেফাজত উঠিয়ে নেয়া হয়, এবং তার দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর নিকট যায় সে ইসলামের ধ্বংসের পথে চলে।

eYbvq Av‡iv G‡m‡Q †h t “আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে সকল ইলাহের পূজা করা হয়, এদের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসারীদের (বিদআতী) চেয়ে কেউ আল্লাহর কাছে অধিক ঘৃণিত নহে।

বিদআতীদের উপর আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে লানত করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের তাওবাহ, ফিদয়া, ফরজ-নফল আমল কোনটাই কবুল করবেন না। তরা যতই প্রচেষ্টা, সালাত, সাওম বাড়িয়ে দেবে, ততই বেশী বেশী আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে। অতএব তাদের সাথে উঠাবসাকে প্রত্যাখ্যান করুন, তাদেরকে অপমানিত করুন, তাদেরকে দূরে ঠেলে দিন যেমন আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, আর রাসূল ও তার পরবর্তী সঠিক পথের দিশারী ইমামগণ তাদেরকে অপমানিত করেছেন। (দেখুন البدع والنهى عنها পৃ ঃ ৫-৭)

m¤§vwbZ fvB I †ev‡biv,

বিদআত সম্পর্কে কোরআন, সুন্নাহ ও কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমের বক্তব্য থেকে দলীল পেশ করার পর এ ব্যাপারে দ্বিধা সংশয় থাকার কথা নয় যে, বিদআত সম্পূর্ণ হারাম। অতএব, দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা লাভের জন্য সুন্নতকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে বিদআতকে পরিহার করতে হবে।

we`Av‡Zi cKvi t

ভালো এবং মন্দের দিক থেকে বিদআতের কোন প্রকার আছে কিনা এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী, ইবনুল আসীর, ক্বারাফী, নববী, আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী এবং ইবনে হাযারের এক মতানুযায়ী বিদআত দু’প্রকার محمودة اومذمومة، حسنة آوسيئة ভাল অথবা মন্দ, প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয়। ইজ্জ বিন আবদুস সালাম এর মতে বিদআত পাঁচ প্রকার- ওয়াজেব, হারাম, মানদুব, মাকরুহ এবং মোবাহ। নিয়মানুযায়ী অবস্থা ভেদে বিদআত এ পাঁচ প্রকারে ভাগ হয়ে যাবে। এমত

পোষণকারীদের সবচেয়ে বড় দলীল হচ্ছে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ সে কথাটি যা তিনি সাহাবাদেরকে এক ইমামের পেছনে তারাবীর নামাযে ইকতেদা করে পড়তে দেখে বলেছিলেন نعمت البدعة هذه এ নতুন পদ্ধতিটি কতনা উত্তম। ওমর (রাঃ) একত্রে তারাবীহ এর নামায পড়াকে বিদআত বলেছেন,উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে শরীয়তে বিদআতে হাছানাহ (উত্তম বিদআত) বলে কিছু আছে।

এছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর দ্বীনের মধ্যে নব আবিস্কৃত সবই বিদআত। ভাল হলে ভাল বিদআত, আর মন্দ হলে মন্দ বিদআত।

এ পক্ষ রাসূল (সাঃ) এর বানী كل بدعة ضلالة এর অর্থ এভাবে করেন যে প্রত্যেক মন্দ বিদআত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা, ভাল গুলো নহে।

*অপরদিকে ওলামায়ে কেরামের অধিকাংশের মতে ভাল-মন্দ বলে বিদআতের কোন ভাগ নেই। বরং বিদআত সম্পূর্ণটাই মন্দ এবং গোমরাহী। আর এর সংজ্ঞা হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ঐ জিনিস যা দ্বীনের মধ্যে নতুন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে যার স্বপক্ষে শরীয়তের কোন প্রমাণ ও ভিত্তি বা দলীল নেই সেটিই বিদআত।

▣ wcq bexi evbx t كل بدعة ضلالة "প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।" এর كل (প্রত্যেক) শব্দ একথা প্রমাণ করে যে, بدعة পুরোটাই গোমরাহী। ভালমন্দ বলে এর কোন প্রকার নেই।

যারা নব উদ্ভাবিত ভাল কাজ গুলোকে بدعت حسنة ভালো বিদআত বলতে চান আমরা তাদেরকে বলব, দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন জিনিষটির স্ব-পক্ষে যদি শরয়ী দলীল থাকে তাহলে তো সেটি বিদআতই নয়, বরং সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। অতএব بدعت حسنة বলার দরকার কি? আর যেটি দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় সেটাতো বিদআতের সংজ্ঞার ভিতরেই পড়ে না। রাসূল যেহেতু ভাগ করেননি, সেহেতু بدعة কে দু'ভাগ করাও আরেক بدعة হবে। উপরোক্ত দৃষ্টি ভঙ্গি পোষণ করেই ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে তাইমিয়া, ইবনে রযব আল-হাম্বলী, ইমাম শাফেয়ী, আবদুল গনী মোহাদ্দেস দেহলভী, মোজাদ্দেদে আলফে সানী শেখ আহমদ সারহন্দী, রশীদ আহমদ গনগুহী, শাহ ইমাঈল শহীদ, শিব্বীর আহমদ উসমানী, মাওঃ আবদুর রহীম সহ অসংখ্য আলেম এ কথা বলেছেন যে, বিদআত সম্পূর্ণটাই গোমরাহী। বিদআতে হাছানা বলতে কিছু নেই। ওমর (রাঃ) যে نعمت البدعة هذه বলেছেন, এর দ্বারা শরীয়তের পরিভাষায় বিদআতে হাছানা নামক বিদআতের একটি প্রকার রয়েছে একথা বুঝা যায় না। কারণ, পরিভাষাগুলো আবিস্কৃত হয়েছে পরবর্তীতে। ওমর (রাঃ) মূলতঃ বিদআতের শাব্দিক অর্থই বুঝাতে চেয়েছেন। যা শরয়ী অর্থের চেয়ে ও ব্যাপক। শাব্দিক অর্থে ভাল-মন্দ নতুন যে কোন জিনিসকেই বিদআত বলা যেতে পারে। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় মন্দ হলেই কেবল তাকে বিদআত বলা হয়।

এছাড়া ওমর (রাঃ) এর এ কাজটি তো সাধারণত সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ রামাদান মাসের কিয়াম সুন্নাত। রাসূল স্বয়ং এ ব্যাপারে সাহাবাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه- যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং সাওয়াবের আশায় রামাদানে কিয়াম করবে তার পূর্বের সবগুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

রাসূল (সাঃ) নিজেও সাহাবাদেরকে নিয়ে কয়েকদিন জামাতের সাথে মসজিদে কিয়াম করেছেন। কিন্তু যখন লোক অতিরিক্ত বেড়ে গেল তখন তিনি এ ভয়ে মসজিদে আসা বন্ধ করে দিলেন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একে আবার ফরজ করে দেয়া হয়। রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল অর্থাৎ রাসূল সবাইকে নিয়ে একত্রে জামায়াতে পড়েননি। বরং সবাই নিজে নিজে অথবা ছোট ছোট দলে পড়ত। আবু বকর (রাঃ) এর সময়ে ও এভাবে চলছিল। ওমর (রাঃ) তাঁর সময়ে এ অবস্থা দেখে বললেন, আমি চাই সবাই মিলে একজন ইমামের পেছনে জামায়াতের সাথে পড়া হোক। এ বলে তিনি উবাই ইবনে কাব (রাঃ) কে ইমাম বানিয়ে দিলেন। সাহাবারা তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামায পড়তে লাগলেন। তখন ওমর বলেছিলেন, এ নতুন পদ্ধতিটি কতই না উত্তম। রাসূলের মৃত্যুর পর যেহেতে ওহী বন্ধ হয়ে গেছে কাজেই একে ফরজ করে দেয়ার আশংকা ও আর থাকলনা। এদিকে সকল সাহাবা ওমর (রাঃ) এর কাজকে সন্তুষ্ট চিত্তে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। এতে সাহাবাদের ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হল। উপরন্তু এটি খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত ও বটে যার অনুসরণ রাসূল আমাদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

▣ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى-

"আমার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর, এবং আমার পরে হেদায়েত প্রাপ্ত+ খোলাফাদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের জন্য অপরিহার্য।"

অতএব রমযান মাসে জামাতের সাথে তারাবীহ পড়া সুন্নাত, বিদআত নহে। ওমর (রাঃ) শাব্দিক অর্থের দিক থেকে একে বিদআত বলেছেন।

tgvïvK_v n‡jv, بدعة শব্দটি আভিধানিক অর্থে নতুন আবিস্কৃত বস্তু বা বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মানবতার কল্যাণে জাগতিক যে কোন জিনিসের ব্যাপারে শরীয়ত এর অনুমোদন দেয়। বিজ্ঞানের এ স্বর্ণ যুগে আবিস্কৃত স্রষ্টা কর্তৃক সমর্থিত জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণ কেই বৈধ বলে অখ্যায়িত করে। এ ক্ষেত্রে আবিষ্কারকের নিয়ত বিশুদ্ধ থাকলে তিনি আল্লাহর কাছে সাওয়াব ও পাবেন।

আর দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত নতুন আবিস্কৃত বিষয় গুলো দু'ধরনের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে এমন যা দ্বীনের জন্য সহযোগীর ভূমিকা পালন করে। যেমন ঃ পবিত্র কোরআনকে একত্রিত করা, নুক্তা এবং হরকত দিয়ে একে সৌন্দর্যমন্ডিত করা, হাদীস, তাফসীর, নাহু সরফের বই রচনা করা। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিমার্ণ করা। ইসলামকে হেফাজত করার লক্ষ্যে শত্রুর মোকাবিলায় বন্দুক, রাইফেল,কামান, পারমনেটিক ক্ষেপনাস্ত্র, যুদ্ধজাহাজসহ বিভিন্ন রণসামগ্রী প্রস্তুত করা ইত্যাদি। উপরোক্ত জিনিসগুলো আভিধানিক অর্থে বিদআত হলেও শরীয়তের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় পরিভাষিক অর্থে বিদআত নহে।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা যেমন ঃ রবিউল আউয়াল মাসের ১২তারিখ অথবা অন্য যে কোন সুখ-দুঃখের সময় মীলাদের আয়োজন করা। এক জায়গায় যিকরের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে সুর করে যিক্র করা। জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা ইত্যাদি। এ জাতীয় বিদআতই আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। এটিই প্রকৃত বিদআত যে ব্যাপারে কোরআন এবং হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মানুষদেরকে সর্তক করে দিয়েছেন।

দ্বীনের জন্য আবিষ্কার আর দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কারের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটি দ্বীনের সহযোগীতা, হেফাজত ও সংরক্ষণের জন্য করা হয় । আর দ্বিতীয়টি সহযোগীতার জন্য নয় বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ কল্পে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা হয় ।

প্রথমটি মুসলমানদের অন্তরে দ্বীনের মর্যাদা এং শানকে বাড়িয়ে দেয় । আর দ্বিতীয়টি বিদআতিদের অন্তরে দ্বীনের মর্যাদা ভুলণ্ঠিত করে ।

দ্বিতীয়টির কারণে সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায় । যেমন রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ
ماحدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة-
"কোন সম্প্রদায় বিদআতে লিপ্ত হলে বিদআত সমপরিমান সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায় । আর প্রথমটি সুন্নাতকে স্ব-স্থানে টিকিয়ে রাখার ভূমিকা পালন করে ।

m¤§wbZ cvVK cwVKv, fvB I †evb‡biv!

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথাটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে দ্বীনি বিষয়ে নব-উদ্ভাবিত সবকিছুই পথভ্রষ্টতা । একে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি ।

১ । বিশ্বাসগত বিদআত (بدع اعتقادية) । আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে দেয়া সংবাদের বিপরীত বিশ্বাস লালন করা । যেমন ঃ আল্লাহর গুণরাজীকে সৃষ্টির গুণের সাথে তুলনা করা অথবা উহাকে গুণহীন মনে করায় বিদআত । এমনি ভাবে তাকদীরকে অস্বীকার করার বিদআত ।

২ । আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিদআত (بدع علمية) । এটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রণীত বিধানকে বাদ দিয়ে তার ইবাদত করা এটি কয়েক রকম হতে পারে ।

- ✓ এমন ইবাদত আবিষ্কার করা যা আল্লাহ তায়ালা প্রণয়ন করেন নি ।
- ✓ শরীয়ত সম্মত ইবাদতের মধ্যে বাড়ানো বা কমানো ।
- ✓ নতুন করে বানানো পদ্ধতিতে শরীয়ত সম্মত ইবাদত পালন করা ।
- ✓ শরীয়ত সম্মত ইবাদতের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া, যাকে শরীয়ত উন্মুক্ত রেখেছে । এ জাতীয় বিদআতের উদাহরণ হচ্ছে, কবরের উপর ঘর বানানো, বিভিন্ন উৎসব পালন করা, নুতন আবিস্কৃত অনুষ্ঠানাদী ইত্যাদি ।

৩ । ছেড়ে দেয়ার বিদআত (بدعة الترك) ঃ শরীয়তে বৈধ কোন কাজ ছেড়ে দেয়া অথবা ইবাদত হিসেবে যা করার জন্য বলা হয়েছে তা না করা । যেমন ঃ ইবাদত মনে করে মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়া, বিয়ে শাদী না করা ইত্যাদি ।

ûK‡gi w`K †_‡K we`AvZ Avevi ` cKvit

১ । এমন বিদআত যা বিদআতকারী ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে কাফির বানিয়ে দেয় । (بدعة مكفرة) যেমন ঃ রাফেযী সম্প্রদায়ের বিদআতী আকীদা, আর মু'তাযেলীদের কোরআনকে মাখলুখ মনে করার আকীদা ।

২ । এমন বিদআত যা ফাসিক বানিয়ে দেয় (بدع مفسقة) । এ জাতীয় বিদআত কারী গুনাহগার হবে । তবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবেনা । এর উদাহরণ হচ্ছে, সম্মিলিত ভাবে যিকরের বিদআত, এবং ইবাদতের জন্য শাবান মাসের ১৫তারিখের রজনীকে খাস করার বিদআত ।

e`AvZ‡K †Pbvi KwZcq gjbxwZ t

- ✓ সুন্নতের পরিপন্থী যাবতীয় কথা, কাজ, আকীদা বিদআত ।
- ✓ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এমন সব কাজ করা যা শরীয়ত নিষেধ করেছে ।
- ✓ শরীয়তের দলীল ছাঢ়া যাবতীয় ইবাদত ও আকীদা ।
- ✓ প্রত্যেক ঐ ইবাদত যার পদ্বতি দূর্বল অথবা জাল হাদীসে ছাড়া বিশুদ্ধ হাদীসে পাওয়া যায় না ।
- ✓ প্রত্যেক ঐ ইবাদত যাকে শরীয়ত مطلق (শর্তহীন) রেখেছে, অথচ লোকেরা তাকে স্থান, কাল অবস্থা বা সংখ্যার সাথে مقيد (শর্তযুক্ত) করে দিয়েছে ।
- ✓ প্রত্যেক ঐ বিষয় যা দলীল ছাড়া শরীয়তসম্মত হওয়া সম্ভব নয় । দলীল না থাকলে উহা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে । কোন সাহাবীর পক্ষ থেকে হলে আলাদা কথা ।
- ✓ কতিপয় আলেম যাকে মোস্তাহাব বলেছেন (বিশেষ করে পরবর্তী আলেমগন) অথচ কোন দলীল নেই । ইহা বিদআত ।
- ✓ ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত করা ও বিদআত ।
- ✓ *Av‡iv ¸i“ZcY `ÛU bxwZgvjv hv we`AvZ‡K wPb‡Z Ges G‡K cZ¨vL¨vb Ki‡Z mvnvh¨ Ki‡e|*

১। ইবাদতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, নিষিদ্ধ হওয়া, থেমে থাকা, স্থগিত থাকা যতক্ষণ না এর স্ব-পক্ষে শরীয়তের দলীল পাওয়া যায় ।

২। প্রত্যেক ঐ ইবাদত যা করার সুযোগ এবং পরিবেশ রাসূল (সাঃ) ও সাহাবিদের সময়ে ছিল কিন্তু তারা করেননি, তাদের এ না করা একথাই প্রমাণ করে যে এটা শরীয়ত সম্মত নহে ।

¸i“ZcY `ÛU `wó AvKlYx t

c_gZ t ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলামে নুতন কিছু উদ্ভাবন করে সেটাকে উত্তম মনে করল, সে এ ধারণা পোষণ করল যে, মোহাম্মদ (সাঃ) রেসালাতের ব্যাপারে খেয়ানত করেছেন । কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম । অতএব যা ঐ দিন দ্বীন ছিলনা আজ তা দ্বীন হতে পারে না ।"
দ্বিতীয়ত ঃ শায়খ আলবানী (র.) বলেন, এ বিষয়টি আমাদের জানা থাকা উচিৎ যে সবচেয়ে ছোট বিদআত যা কেউ দ্বীনের মধ্যে নিয়ে আসে তা হারাম । সুতরাং বিদআত সমূহের মধ্যে মাকরুহ বলে কোন স্তর নেই । যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে ।

Bev`‡Zi bv‡g cPwjZ we`AvZmgn t

প্রিয় পাঠক, বিদআতের পরিচয়, শরীয়তে এর হুকুম, এর প্রকার এবং বিদআত চিহ্নিত করার কতিপয় আলামত পেশ করার পর এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইবাদতের নামে প্রচলিত বিদআতসমূহের কিছু আলোচনা তুলে ধরছি-

ivmj (mvt) Gi fv‡jvevmvi `vex‡Z cKwkZ we`AvZmgn t

(১) সূফীদের এ দাবী যে-তারা রাসূলকে স্ব-শরীরে জাগ্রত অবস্থায় দেখে ।

(২) রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে এ ধারণ পোষণ করা যে তিনি মৃত্যুবরণ করেননি । দুনিয়াবী জীবনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সহকারে মৃত্যুর পর ও জীবিত রয়েছেন । তিনি স্ব-শরীরে যে কোন মজলিস বা স্থানে উপস্থিত হন । ইচ্ছামত সারা পৃথিবী পরিভ্রমন করেন, যেমন ইচ্ছা তেমন রূপধারন করেন । বিশেষ করে মিলাদের মাহফিলে তিনি স্ব-শরীরে উপস্থিত হন । এ জন্য লোকেরা তার আগমণে দাঁড়িয়ে যায় । কামিল লোকেরা তাকে দেখতে পায়, কেবলমাত্র অস্বীকারকারী বা মূর্খরাই দেখতে পায়না । (নাউযুবিল্লাহ)

⚜ আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

أنك ميت وانهم ميتون-

"নিশ্চয় আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তাদেরকেও মরতে হবে।" (সূরা যুমার ঃ ৩১)

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হলো যে- রাসূল (সাঃ) অন্যান্যদের মত মৃত্যুবরণ করবেন। আর এ ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে-রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। এর দ্বারা রাসূলের কবরে জীবিত থাকার বিষয়টি বাধাগ্রস্ত হয়না। কারণ, দুনিয়ার জীবন আর বরযখী জীবনতো এক রকম নয়। অতএব একটাকে অন্যটার উপর কেয়াস করে রাসূলের ব্যাপারে এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা বিদআত। প্রিয় নবী কবরে জীবিত কিনা, এব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মত হচ্ছে ঃ

⚜ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা শহীদদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

ولاتقولوا لمن يقتل فى سبيل الله اموات ، بل احياء ولكن لا تشعرون-

"যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু বরণ করেছেন, তোমরা তাদেরকে মৃত বলোনা, বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারছনা।" (আল-বাকারা ঃ ১৫৪)

⚜ অন্য আয়াতে এসেছে ঃ

بل احياء عند ربهم يرزقون-

"বরং তরা তাদের প্রভুর নিকট জীবিত তাদেরকে রিয্ক প্রদান করা হয়।" (আল-ইমরান ঃ ১৬৯)

শহীদদের মর্যাদা যদি এমন হয় যে, তারা সেখানে জীবিত তাহলে নবীদের মর্যাদাতো আরো অনেক গুণ বেশী, সুতরাং তারাও সেখানে জীবিতদের সর্বোচ্চ মর্যাদা পাচ্ছেন। তাদের পবিত্র শরীর ও কবরে অপরিবর্তিত এবং অক্ষুন্ন রয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যখন কেউ আমার উপর সালাত ও সালাম পেশ করে তখন দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশতা তা আমার কবরে পৌঁছিয়ে দেয়। আল্লাহ আমার রুহ ফিরায়ে দেন। আর আমি তৎক্ষনাত জবাব দেই। জনৈক সাহাবী তখন বললেন, কিভাবে? আপনি তো পচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাবেন। রাসূল (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তায়ালা নবীদের শরীর মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে কারণে মাটি তাদের শরীরের কোন পরিবর্তন করতে পারবেনা। তবে আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবেনা। কবর যা বরযখী জিন্দিগীর উপর দুনিয়ার জীবনকে কিয়াস করার কোন যৌক্তিকতাই নেই।

(৩) রাসূলকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়ার কোন কিছু সৃষ্টি হত না এমন আকিদা পোষণ করা।

لولاك ما خلقت الافلاك-

"হে রাসূল! আপনি যদি না হতেন তাহলে আমি আসমান-জমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।" এ মর্মে কথিত হাদীসটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইবনুল যাউজী, সায়ূতী, নাসের উদ্দীন আলবানী সহ অনেকেই হাদীসটিকে মউযু বলেছেন। দেখুনঃ (سلسلة الاحاديث الموضوعة والضعيفة) (খন্ডঃ ১ পৃ ঃ১৯৯-২০০)

(৪) রাসূল (সাঃ) এর ব্যক্তিসত্ত্বা এবং তাঁর মর্যাদাকে উসীলা করে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। যেমন এভাবে বলা ঃ

اللهم اتوسل اليك بنبيك، اللهم بجاه نبيك اغفرلى-

"হে আল্লাহ! আপনার নিকট আপনার নবীকে উসীলা বানাচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনার নবীর মর্যাদার উসীলায় আমাকে মাফ করুন।"

এমনিভাবে পীর, ওলী, তথাকথিত গাউস-কুতুব-আবদাল এর উসীলা দিয়ে দোয়া করা ও বিদআত। কারণ এ জাতীয় উসীলা শরীয়তসম্মত নয়। নিজের ঈমান, নেক আমল এবং আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামসমূহের উসীলা দিয়ে দোয়া করা যায়। এ ছাড়া কোন জীবিত, উপস্থিত নেককার লোকের কাছে গিয়ে এভাবে বলা যে-"আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন এটা ও জায়েজ। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট গিয়ে তার কাছে চাওয়া অথবা তার উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া শিরক এবং বিদআত।

অনেকে বলেন যে- "হযরত আদম (আঃ) রাসূল (সাঃ) এর উসীলা দিয়ে দোয়া করায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন।" এ হাদীসটি মাউযু (বানোয়াট বা ভিত্তিহীন) মূলত ঃ যে কথা বলে দোয়া করায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন তা হচ্ছে কোরআনের আয়াত ঃ

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (الاعراف-২৩)

"তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো ও দয়া না করো তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো।" (সূরা-আরাফ ঃ ২৩)

কোন কোন ভাই বলে থাকেন যে- আল্লাহ নিজেই উসীলা তালাশের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নিকট উসীলা তালাশ কর।" (মায়েদা ঃ ৩৫)।

এখানে উসীলা বলতে তাঁরা নবী-অলীদের মৃত্যুর পর ও তাদের সত্তার উসীলা দিয়ে দোয়া করাকে বুঝান। তাদের এ অর্থ গ্রহণ সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ সকল সাহাবা, তাবেয়ী এবং তাফসীরের বড় বড় ঈমামগণ বলেছেন ঃ "আয়াতে উসীলার অর্থ হচ্ছেঃ التقرب الى الله بصالح الاعمال নেক আমল সমূহ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা) অতএব কোন মৃত ব্যক্তি, চাই নবী হোক, ওলী হোক, পীর হোক তাদের উসীলা বা দোহাই দিয়ে দোয়া করা বিদআত।

আমাদের কতিপয় ভাই বোখারী শরীফে বর্ণিত হযরত ওমরের নিম্নোক্ত হাদীসকে উসীলার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করতে চান ঃ

عن انس بن مالك أن عمربن الخطاب كان اذا قحطوا استقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون (صحيح البخارى ২/৩২)

"আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ওমর (রাঃ) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) এর উসীলায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন। তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনার নবীর উসীলা দিয়ে বৃষ্টি চাইতাম, তখন আপনি বৃষ্টি দিতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার উসীলা দিয়ে বৃষ্টি চাচ্ছি, আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ তখন তাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হলো।"

Zvi‡v e‡jb t এখানে ওমর (রাঃ) আব্বাসের উসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া চেয়েছেন, যেমন রাসূলের উসীলা দিয়েও তারা চাইতেন।

Avgiv ejet তাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, ওমর (রাঃ) এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে- হে আল্লাহ! আপনার হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ) যখন জীবিত ছিলেন, তখন আমরা তার কাছে গিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করে আপনার নিকট দোয়া চাইতে বলতাম। তিনি যখন বর্তমানে জীবিত নেই তখন তো আর তার উসীলায় চাওয়া যায় না। অতএব আমরা তারই সম্মানিত চাচা আব্বাস (রাঃ) যিনি এখন ও জীবিত আছেন, তার কাছে গিয়েই দোয়াপ্রার্থী হয়েছি। তিনি যেন আমাদের হয়ে আপনার কাছে দোয়া করেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা! একটু লক্ষ্য করুন, মৃতব্যক্তির উসীলা দিয়ে দোয়া করা যায়না বলেই ওমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) এর দ্বারস্থ হয়েছেন। যদি জায়েজ হত তাহলে এ কথা কল্পনা করা যায় না যে-ওমর (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে বাদ দিয়ে আরেক জনের কাছে দোয়ার জন্য যাবেন।

A‡b‡K e‡jb t আল্লাহর প্রিয়জনদের উসীলা দিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ সহজে দোয়া কবুল করে নেন। যেমন দুনিয়ায় এমনটি হয়ে থাকে। বড় বড় মন্ত্রী-মিনিষ্টারদের কাছে নিজে সরাসরি না গিয়ে তাদের পি.এ অথবা পরিচিত জনদের মাধ্যমে দরখাস্ত পৌঁছালে তা সহজে মঞ্জুর হয়। কারণ মন্ত্রী-মিনিষ্টার তো আর সরাসরি দরখাস্তকারীকে চেনেন না, তাই এদের মাধ্যমে হলে অনুমোদন করতে সুবিধা হয়। দুনিয়াবী ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

wKš Avgvi fvB‡`i Kv‡Q ck t আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্ষেত্রে ও কি ব্যাপারটি এ রকম? তিনি কি মিডিয়া ছাড়া সরাসরি বান্দার অবস্থা জানতে পারেন না?

তাঁরও কি কোন কিছু জানার জন্য পি.এ বা মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন পড়ে? কখন ও নয়। তিনি হচ্ছেন ঃ

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ر الحشر /٢٢)

"তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান-অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।"

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (البقرة / ٢٥٥)

"তিনি তাদের সামনের, পেছনের, বর্তমান, অবর্তমান সবকিছু জানেন।"

وَاللهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (ال عمران /١٥٣)

"আল্লাহ অন্তরের সমুদয় বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন।"

এ কারণেই তাঁর কাছে চাইতে গিয়ে অন্য কোন সত্ত্বাকে উসীলা করলে তিনি ক্ষুদ্ধ হন, অসন্তুষ্ট হন। তাই সরাসরি আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে।

wcq fvB‡qiv! পবিত্র কোরআনে আদম (আঃ) থেকে নিয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত (اولوا العزم) দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী অনেক নবী-রাসূলের দোয়া স্থান পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউই তো অন্য কোন নবী বা কোন সত্ত্বার উসীলা দিয়ে দোয়া করেননি। সুতরাং আমরা সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইব। অন্য কোন সত্ত্বার উসীলা দেবনা।

(৫) রাসূল (সাঃ) গায়েব জানেন এ জাতীয় আকীদা পোষণ করা শিরক ও বিদআতের পর্যায়ভূক্ত। কারণ-

পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ-

"আপনি বলুন! আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে। আরো বলুন যে, আমি অদৃশ্য বিষয়েও অবগত নই।"(আনআম ঃ ৫০)

অন্য আয়াতে এসেছে,

ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخيروما مسنى السوء-

"আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে বেশী বেশী কল্যাণের কাজ করতে পারতাম, আর অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারতনা।" (আরাফ ঃ ১৮৮)

অথচ আমরা দেখি যে, গায়েব না জানার কারণে তিনি কাফেরদের দ্বারা একাধিক বার প্রতারিত হয়েছেন। বি'রেমউনার ঘটনা, খোবাইব (রাঃ) এর ঘটনা ইহার উজ্জল প্রমাণ। আয়েশা (রাঃ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইফকের ঘটনাসহ অসংখ্য ঘটনা একথা প্রমান করে যে রাসূল (সাঃ) গায়েব জানতেন না। আল্লাহ যখন তাকে যতটুকু জানাতেন ঠিকততটুকু তিনি জানতে পারতেন।

(৬) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নূরের তৈরী এমন ধারণা করা বিদআত। যেহেতু পবিত্র কোরানে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنْتمْ فِى رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَكُم مِنْ تَرَابٍ-

"হে মানব সমাজ! তোমরা যদি পুনরুত্থানে সন্দেহ পোষণ কর, তাহলে জেনে রেখো, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা-হজ্জ ঃ ৫)।

অর্থাৎ- প্রথম মানব আদম (আঃ) কে মাটি দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন তারই বংশধরদের একজন। অতএব তিনিও মূলতঃ মাটির তৈরী।

রাসূল (সাঃ) হচ্ছেন বাশার, যেমন আল্লাহ তায়লা বলেন ঃ

قل انما انا بشرمثلكم يوحى الى

"হে রাসূল (সাঃ) আপনি বলুন! আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ, তবে আমার নিকট ওহী পাঠানো হয়।" (সূরা কাহফ ঃ ১১০)

অন্য আয়াতে এসেছে ঃ

انى خالق بشرا من طين-

"আমি বাশারকে মাটি থেকে সৃষ্টিকারী।" (সূরা সোয়াদ ঃ ৭১)

উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূল মানুষ, তিনি বাশার, আর আল্লাহ মানুষদেরকে বাশারকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি নুরের তৈরী, বা আল্লাহর জাতীয় নূরের অংশ এমন আকীদা সম্পূর্ণ বেদআত। তবে তিনি আলোর সমতূল্য এবং কোরআনে তাকে উজ্জল প্রদীপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৭) ওয়াজ মাহফিলে সময় নারায়ে রেসালাত বলে ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা বিদআত।

(৮) আযানের সময়, আযান শুরুর পূর্বে রাসূল (সাঃ) এর উপর কয়েকবার দুরুদ পড়া বিদআত। মোল্লাআলী কারী এ ব্যাপারে বলেন ঃ বর্তমানে মোয়াজ্জিনেরা আযানের পর পর রাসূল (সাঃ) এর উপর পুনঃ পুনঃ সালাত ও সালামের যে ঘোষণা দেয়, এটি মূলতঃ সুন্নাত, কিন্তু পদ্ধতিটি বিদআত। কারণ, মসজিদে আওয়াজ বোলন্দকরা যিক্‌রের জন্য হলেও তা মাকরুহ।

আল্লামা রশীদ আহমদ বলেন ঃ আযানের পূর্বে উচ্চস্বরে হোক অথবা নিম্ন স্বরে হোক রাসূল (সাঃ) এর উপর দুরুদ পড়া জায়েজ নহে। কারণ, এটি বিদআত এবং দ্বীনের মধ্যে অতিরিক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নহে।

(৯) আযানের সময় রাসূল (সাঃ) এর নাম আসলে চোখে আঙ্গুল লাগিয়ে চুমু খাওয়া বিদআত।

(১০) রাসূলের মৃত্যু দিবসে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা, এমনি ভাবে যে তারিখে তাঁর রোগ একটু নিরাময় হয়েছিল সে তারিখে ছুটি পালন করা সুন্নাতের পরিপন্থী।

রাসূল (সাঃ), সাহাবা, তাবেয়ীন তথা উত্তম যুগের কারো কাছ থেকে এ জাতীয় কার্যাবলী বিশুদ্ধ সনদে প্রমানিত না হওয়ায় এগুলো বিদআত এর অন্তর্ভূক্ত।

ivmj jvn (mvt) Gi Kei whqviZ m¤úwKZ we`AvZ t

প্রিয় নবীর কবর যিয়ারতের শরীয়ত সম্মত পদ্ধতি হচ্ছে ঃ প্রথমে মসজিদে প্রবেশের দোয়া পড়ে নেবে এরপর সম্ভব হলে রাউযাতুম মিন রিয়াযিল জান্নাতে গিয়ে অথবা মসজিদের যে কোন স্থানে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করে রাসূল (সাঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) এর কবরের কাছে গিয়ে এভাবে বলবে-

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ياابابكر، السلام عليك ياعمر-

মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে এসে উপরোক্ত পদ্ধতিতে যিয়ারত করা মোস্তাহাব। কিন্তু লোকেরা রাসূলের কবর যিয়ারত কে নিয়ে যে সকল বিদআতী আকীদা ও কাজ আবিষ্কার করেছে নিম্নে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো ঃ

(১) এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব। অনেকের ধারণা- রাসূলের কবর যিযারত হজ্জের কার্যাবলীর অন্যতম একটি অংশ। এছাড়া হজ্জ্ব পরিপূর্ণ হয়না। শরীয়তের বিধি-বিধান এবং ইবাদতের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় এ জাতীয় ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া কতিপয় অগ্রহণযোগ্য বানানো হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে। যেমন ঃ

من زار قبرى وجبت له شفاعتى-

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করলো তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল।"

এ হাদীসটি মুনকার। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না।

আরেকটি কথা এভাবে প্রচলিত আছে ঃ

من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى-

"যে ব্যক্তি হজ্জ করল অথচ আমার কবর যিয়ারত করল না সে আমার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করল না।" এ হাদীসটি বানানো (موضوع)।

সুতরাং موضوع হাদীসের উপর ভিত্তি করে রাসূলের কবর যিয়ারতকে ওয়াজিব বলা বিদআত।

(২) মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় রাসূল (সাঃ) এর কাছ থেকে প্রবেশানুমতি প্রার্থনার ছুরতে প্রবেশ করা।

ابو الحسن الشاذلى على بن عبد الله নামক জনৈক সূফীর হাস্যকর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মসজিদে নববীর দরজায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত খালি মাথায় খালি পায়ে রাসূলের অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন ঃ রাসূলের অনুমতির অপেক্ষায় আছি। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ হে মু'মিনগণ! নবীর অনুমতি ছাড়া তার ঘরে প্রবেশ করোনা। (সুরা আহযাব ঃ ৫৩) তখন নাকি তিনি রওজা শরীফের ভেতর থেকে আওয়াজ শুনেছেন, হে আলী প্রবেশ কর।"

এ জাতীয় ধারণা ঘৃণীত বেদআতের অন্তর্ভূক্ত, পূর্বের এবং পরের কোন বিজ্ঞ আলেম এ ধরণের মত পোষণ করেননি। রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর ঘরে প্রবেশের সময় অনুমতি নেয়ার নির্দেশের উপর তাঁর মৃত্যুর পর মসজিদে প্রবেশের সময় অনুমতি গ্রহণের বিষয়কে কিয়াস করা সম্পূর্ণ বাতেল। এটি শরীয়ত সম্মত হলে অবশ্যই সাহাবীরা তা করতেন।

(৩) রাসূলের কবর যিয়ারতে সালাম, দোয়া এবং দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা। যেমন ঃ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নামাযের মত করে কবরের সামনে দাঁড়ানো, রাসূলের কাছে সুপারিশ লাভের আকাঙ্খা পেশ করা, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যায়না তা রাসূলের কাছে চাওয়া, শিরক এবং বিদআতের অন্তর্ভূক্ত।

(৪) রাসূলের কবরের বেষ্টনীকে স্পর্শ করা, চোখে মুখে লাগানো, জানালায় চুমু খাওয়া, কবরের চতুর্দিকে ঘোরা।

(৫) রাসূলের কবরকে ঈদের বস্তু বানানো। এর অর্থ হচ্ছে ঃ বারবার কবরের কাছে আসা যাওয়া করা, সেখানে ভীড় জমানো। যেমনটি সাধারণত ঈদের সময়ে ঈদের স্থান সমূহে হয়ে থাকে। অথবা কবর যিয়ারতের জন্য প্রতি সপ্তাহে বা মাসে বা বৎসরে সময় নির্দিষ্ট করে নেয়া। রাসূল (সাঃ) এটা নিষেধ করেছেন ঃ

لاتجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبرى عيدا، وصلوا على، فان صلاتكم تبلغنى حيث كنتم-

"তোমরা তোমাদের ঘর গুলোকে কবর বানিয়ে ফেলোনা, আর আমার কবরকে ঈদের বস্তু বানাবে না। আমার উপর তোমরা দুরুদ পড়। কেননা তোমাদের দুরূদ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন আমার কাছে পৌঁছে যায়।

(৬) যিয়ারতকারীর এ বিশ্বাস রাখা যে, রাসূল (সাঃ) তাঁর নিয়ত এবং অন্তরের কথা জানেন।

(৭) আটদিন মদীনায় অবস্থান বাধ্যতামূলক করে নেয়া, এবং ৪০ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে নববীতে দোযখ থেকে মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য পড়া।

এ বিষয়ে কথিত হাদীসটি এমন দূর্বল যে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা শুদ্ধ হবেনা।

▣ হাদীসটির ভাষ্য হলো ঃ রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার এ মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি এবং আযাব থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে আর সে মুনাফেকী থেকে বেঁচে থাকবে।"

এটি বিদআত হবার কারণ হচ্ছে- এখানে নির্দিষ্ট দিন এবং নামাজকে নির্দিষ্ট সাওয়াবের সাথে খাস করা হয়েছে, অথচ সহীহ হাদীস না হলে এমনটি করা যায়না।

(৮) যিয়ারতের প্রাক্কালে রাসূল (সাঃ) এর সামনে সাদাকাহ পেশ করা। আল্লাহ তায়ালার বানী ঃ "হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা রাসূলের সাথে একান্তে আলাপ কর তখন আলাপের আগে কিছু সদকা পেশ কর।" (সূরা মুজদালাহ ঃ ১২)

এর আলোকে কেউ কেউ সদকাহ পেশ করার কথা বলেছেন। অথচ জমহুরে ওলামার মতে পরবর্তী আয়াতের দ্বারা এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া সদকা সহকারে রাসূলের জিবদ্দশায় কথা বলার উপর তা মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতকে তুলনা করা একেবারেই বাতিল। সালাম পেশ করা আর সংগোপনে কিছু বলা কি সমান?

(৯) রাসূলের সামনে নিজের অভিযোগ পেশ করে সাহায্য প্রার্থনা করা। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তোমরা একমাত্র আমাকে ডাক, আমার কাছে সাহায্য চাও, আমার উপর ভরসা রাখ, আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেনা, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেনা। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে অভিযোগ করা, সাহায্য চাওয়া শিরক।

(১০) কাবা শরীফের উপর কেয়াস করে অপলক নেত্রে রাসূল (সাঃ) এর রওযার দিকে তাকিয়ে থাকা।

(১১) কারো মাধ্যমে রাসূলের কবরে সালাম পাঠানো। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনার সুরে আবেদন করব যে, হে আল্লাহ! আপনার প্রিয় হাবীবের উপর আপনি রহমত বর্ষণ করুন, অনুগ্রহ ও দয়া করুন। এক্ষেত্রে অন্য কাউকে এভাবে বলা যে আমার সালাম নবীর রওজায় পৌঁছায়ে দিন, এটা ঠিক নহে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই ফিরিশতাদের দ্বারা সালাম পৌঁছান আর নবী (সাঃ) জবাব দেন।

(১২) সর্বদা কোন নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট দিনে রাসূলের কবর যিয়ারত করা।

(১৩) রাসূলের কবরের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে সালাম দেয়া।

(১৪) রাসূল (সাঃ) এর রওজার সবুজ গম্বুজ দেখামাত্র দুরুদ ও সালাম পাঠ করা।

(১৫) রাসূলের কবরের নিকট না গিয়ে দূর হতে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া। যেহেতু এ জাতীয় কাজের ব্যাপারে হাদীসে কোন নির্দেশ পাওয়া যায়না আর সাহাবারাও এমন কোন কাজ করেননি অতএব এগুলো বিদআত।

mvIqve Ge eiK‡Zi Avkvq wewfb w`em I Drme cvj‡bi we`AvZt

(১) ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন ঃ প্রত্যেক বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে রাসূল (সাঃ) এর জন্মকে কেন্দ্র করে আনন্দ ও খুশী প্রকাশার্থে উৎসব পালন করা বিদআত। রাসূল কখনো এ কাজ করেননি। তাঁর নিজের বা তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবীর বা তাঁর কোন কন্যা, স্ত্রী আত্মীয় বা কোন সাহাবীর জন্মদিন পালনের জন্য কোন নির্দেশ ও তিনি দেননি। খোলাফায়ে রাশেদীনের ৩০ বৎসর, ১১০ হিজরী পর্যন্ত সাহাবাদের সময়কাল ১৭০ হিজরী পর্যন্ত তাবেয়ীগণের যুগ এবং কমপক্ষে প্রায় ২২০ হিজরী পর্যন্ত তাবে-তাবেয়ীদের যুগে কেউই এমন কাজ করেননি। এমনকি আমাদের পূর্ববর্তী অধিকতর উত্তম যুগে ও কোন আলেম এ কাজ করেননি।

বর্তমানে প্রচলিত নবীর জন্মোৎসব পালনের এ বিদআত ৬০৪ হিজরীতে ইরাকের মাওসিল শহরে বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দীন কারখীর নির্দেশে জনৈক দুনিয়া প্রেমিক সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে, যার সাথে শরীয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। শিয়ারা এ মিলাদকে লুফে নিয়ে রাসূল (সাঃ), আলী (রাঃ), ফাতেমা (রাঃ), হাসান-হোসাইন (রাঃ) ও তৎকালীন খলীফা এ ৬জনের জন্য বরাদ্দ করে। পরবর্তীতে এদের মাধ্যমেই মিলাদের বিদআত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সুফীদের নিকট অধিক পছন্দনীয় হয়ে উঠে।

এ মিলাদকে কেন্দ্র করে কত রকমের শরীয়ত বিরোধী কাজ যে পুঞ্জিভূত হয় তার কোন ইয়াত্তা নেই। এ জাতীয় মাহফীলের নামে নারী পুরুষের

সংমিশ্রণসহ ঢোল, সানাই ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে কাওয়ালী পরিবেশন করা হয়। যার অধিকাংশ কথাবার্তাই শিরকে আকবরে ভর্তি থাকে। সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আকীদার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে মিলাদ মাহফিলের বিশেষ মূহুর্তে তারা সকলেই দাঁড়িয়ে যায় এ বিশ্বাসে যে রাসূল এসব উৎসবে হাজির হন। এমনকি কোন কোন অঞ্চলে খালি চেয়ার রেখে দেয়া হয় যাতে রাসূল সেখানে এসে বসেন।

হাক্কানী আলেম ও আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনের সকলেই মিলাদ মাহফিল বিদআত বলেছেন। অতএব আমাদের সকলকে এ থেকে বিরত থাকতে হবে।

(২) রাসূলের জন্মের দিনকে ঈদে মিলাদুন্নবী বলে নামকরণ করা।

(৩) হিজরতের রাত্রি, শবেবরাত ও শবে মে'রাজ, এগুলোকে কেন্দ্র করে উৎসব পালন করা। বাড়ি বাড়ি হালুয়া রুটি বন্টন করা।

(৪) জাতীয় দিবস সহ অন্যান্য নাম না জানা বিভিন্ন দিবস উদযাপন, জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, নববর্ষ পালন বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, এ জাতীয় বার্ষিকী পালন শুরু হলে বছরের এমন কোন দিন কি বাকী থাকবে যে দিন কারো জন্ম বা মৃত্যু হয়নি, বিয়ে-শাদী করেনি? সাহাবায়ে কেরাম এবং বুজুর্গ ব্যক্তিদের হিসাবটা শুধু ধরলেই অন্যদেরটা পালনের জন্য সময়ই পাওয়া যাবেনা। আসলে এ জাতীয় সকল রেওয়াজ মানুষের মনগড়া বানানো। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং এগুলোকে পরিহার করা সকলের ঈমানী দায়িত্ব।

ivm‡ji Dci cwVZe¨ mdx‡`i evbv‡bv `i"`mg‡ni we`AvZ t

সূফীরা রাসূল (সাঃ) এর উপর পড়ার জন্য যে সকল দরূদ আবিষ্কার করেছে, সবগুলোই বিদআত। দরূদে তাজ,দরূদে নারীয়াহ, দরূদে আল ফাতেহ, এ সকল দরূদে তারা এমন সব কথাবার্তা নিয়ে এসেছে যা সরাসরি শিরক। রাসূল (সাঃ) কে উলূহিয়াতের স্থানে পৌঁছিয়ে তারা স্পষ্ট কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছে। আবার এসব দরূদ আবিষ্কার ও পড়ার ফজিলতে এমন সব আজগুবী কথাবার্তা বলেছে যা কোন পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

যেমন দরূদ আল ফাতেহ তথা-

(اللّهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق)

এর ফজিলতে বলা হয়েছে ঃ কোরান এবং যে কোন যিকিরের চেয়ে ইহা (৬০০০) গুণ বেশী শ্রেষ্ঠ। (নাউযুবিল্লাহ)।

`i|‡` mvqv`vn Z_v-

اللّهم صل على سيدنا محمد عدد ما فى علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله

সম্পর্কে বলা হয়েছে এর সাওয়াব অন্য দরূদগুলোর তুলনায় ছয় লক্ষ গুণ বেশী। আর যে ব্যক্তি নিয়মিত প্রত্যেক জুমায় ইহা এক হাজার বার পড়বে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবানদের একজন হয়ে যাবে।

এ সকল দরূদ নাকি রাসূল (সাঃ) তরীকতের শায়েখদেরকে জাগ্রতবস্থায় স্বপ্নে শেখায়েছেন এবং সাথীদেরকে শেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বানানো এ সকল দুরূদের মধ্যে এমন সব অতিরঞ্জিতকরণ সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ী রয়েছে যা সরাসরি শিরকের পর্যায়ে পড়ে যায়।

যেমন একটির কিয়দাংশ হলো-

اللهم جدد وجرد فى هذا الوقت وفى هذه الساعة من صلواتك التامة وتحياتك الزاكيات وصلواتك الاكبر الاتم على اكمل عبد لك فى هذا العالم من بنى ادم...

আরেকটি হচ্ছে ঃ

اللهم صلى على الذات المحمدية واللطيفة الاحدية شمس سماء الا سرار ومظهر الانوار، ومركزمدار الجلال وقطب فلك الجمال.....-

এ জাতীয় আজগুবী আজগুবী অনেক বানানো দরূদ ।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! রাসূলের উপর দরূদ পড়া সর্বোত্তম কাজের একটি । রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

(اولى الناس بى يوم القيامة اكثرهم على صلاة)

"লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আমার অধিকতর নিকটবর্তী হবে যে আমার উপর বেশী দরূদ পড়েছে ।" (তিরমিযী)

তবে আমরা কোন দরূদ পড়ব । কিভাবে পড়ব, সেটাও বুখারী-মুসলিম শরীফের হাদীসে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত কাব বিন উযরাহ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) আমাদের সামনে বের হলেন, তখন আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, কিভাবে আমরা আপনাকে সালাম দেব তা জেনেছি । কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? তখন

রাসূল (সাঃ) বললেন; তোমরা এভাবে বল ঃ

اللّهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللّهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد (رواه البخارى ومسلم)

এ জাতীয় বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দরূদগুলোর উপরই কেবলমাত্র আমরা আমল করব । কারণ, রাসূলের শেখানো দোয়া, যিকির ও দরূদের চেয়ে অন্যদের বানানগুলো কি উত্তম হতে পারে? কখনওনা । অতএব, উত্তমকেই গ্রহণ করতে হবে । আর বাকীগুলো বিদআতের কারণে ছাড়তে হবে ।

পীর মুরিদীর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদআতসমূহ ঃ

বর্তমানে প্রচলিত পীর মুরিদীর সিলসিলা সম্পূর্ণ নুতন মনগড়া উদ্ভাবিত জিনিস । রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনদের যুগে এ পীর মুরিদীর কোন নাম চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায়না । কোরান-হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজে এর স্বপক্ষে কোন দলিল দাঁড় করানো যাবে না । এ সেলসেলা বিদআত বৈ আর কিছুই নয় ।

(১) ইসলামের ইলমকে শরীয়ত, মারেফাত, হাকীকত, তরীকত ইত্যাদী ভাগে ভাগ করা ।

(২ শরীয়তকে ইলমে জাহের আর তরীকত বা মারেফাতকে ইলমে বাতেন বলে অভিহিত করা ।

(৩) ইলমে তাসাউফ নামে নতুন জ্ঞানের চর্চা করা ।

(৪) বর্তমান পদ্ধতিতে পীরের হাতে বাইয়াত করা ।

(৫) কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি তরীকায় ইবাদত করা । এটি জঘণ্য ধরণের ভুল । কারণ, তরীকাতো হবে শুধু একটি আর তা হলো তরীকায়ে মোহাম্মদিয়া ।

(৬) মা-বাপের খিদমত না করে পীরের খিদমত করা।

(৭) পীর-বুজুর্গানের কাছ থেকে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে তাদের শরীর টিপে দেয়া।

(৮) তাসাউফ পন্থীদের মাঝে মুরীদকে তালকীন তথা রূহানী ফায়েজ দেয়ার তথাকথিত পদ্ধতি। যেমন- এভাবে বলা যে, আমার কলব আমার পীরের কলবের প্রতি নিবদ্ধ, তার কলব তার পীরের প্রতি ..... এভাবে হাসান বসীরর সূত্রে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত পৌঁছানো, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

(৯) বর্তমানে পীরদের শেখানো মারেফাতের তরীকা, মোরাকাবা, মোশাহাদা বিশেষ পদ্ধতিতে যিকির সবই নতুন আবিস্কৃত।

(১০) কোন কোন সূফীদের বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ, উপায় উপার্জন ত্যাগ করা, তালিযুক্ত পোশাক পরা, বিয়ে, ঘর-সংসার না করা, খানকার মধ্যে বসে থাকা।

(১১) রাজতন্ত্রের ন্যায় বংশানুক্রমে পীরের ওয়ারিশ বা গদিনশীন হওয়া। নিজেকে কামিল পীর বলে ঘোষণা দিয়ে নিজের জন্য মানুষের কাছ থেকে বাইয়্যাত গ্রহণ করা। এ বিষয়টি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। গ্রাম বলুন আর শহর বলুন সব খানেই এমন কিছু লোক রয়েছে যারা নিজেদেরকে শায়খ বলে দাবী করে। এমন একটা ভাব দেখায় যে, তাদের হাতে বাইয়্যাত না হলে পরকালে নাযাত নেই। তারা মনে করে তরীকত এবং হাকীকতই হচ্ছে মূল। মানুষ যখন এটা জানবে তখনি কেবল তার রবকে চিনতে পারবে। শরীয়ত হচ্ছে খোলস আর মা'রেফাত হচ্ছে মগজ। এভাবে তারা শরীয়তকে তরীকত এবং হাকীকত থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

ثم جعلنك على شريعة من الامرفاتبعها ولاتتبع اهواء الذين لايعلمون-

"অতঃপরঃ হে রাসূল! আমি আপনাকে দ্বীনের ব্যাপারে এক পরিষ্কার রাজপথের (শরীয়ত) উপর কায়েম করে দিলাম। কাজেই আপনি এটাকে মেনে চলুন। ঐ সব লোকের কামনা-বাসনার অনুসরণ করবেন না যারা জানে না।" (সুরা জাসিয়া ঃ ১৮)

এ আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) কে শরীয়তের উপরেই স্থাপন করা হয়েছে। বাকী গুলো শরীয়তের তাবে হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত আরেকটি বিদআত হচ্ছে পীরের পক্ষ থেকে নিজের বড় ছেলেকে গদিনশীন মনোনিত করে যাওয়া। যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক। প্রথমতঃ এ সিসটেমটাই নুতন আবিস্কৃত। পীর সাহেব রূপে গদিনশীন থাকা, অন্যকে বানানো। খানকার নামে হাদীয়া-তোহফার কারখানা খোলা এ সবই পরিত্যাজ্য। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চাইবেন তাকে দ্বীনের খিদমতের জন্য কবুল করবেন, মনোনিত করবেন। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকলে পিতার পুত্র দায়িত্ব পেতে পারেন। যেমন দাউদের (আঃ) ছেলে সুলাইমান (আঃ)। আর অযোগ্য হলে অভিশপ্ত ও হতে পারেন যেমন নূহ (আঃ) এর পুত্র কেনআন।

(১২) পীরের পক্ষ থেকে কোন কোন মুরীদকে খেলাফত প্রদান করা।

(১৩) "পীর ধরা ফরজ" এমন কথা বলা। "যার পীর নাই তার পীর হচ্ছে শয়তান" এমন অশোভনীয় বাক্য উচ্চারণ করা।

(১৪) সালামের পরিবর্তে মুরুব্বী বা পীরদের কদমবুসি করা।

(১৫) স্বপ্নে পীরের কাছ থেকে পাওয়া তরীকায় নফল ইবাদত করা ।

(১৬) পীরের নির্দেশে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজকে বৈধ মনে করা । এ ধারণার বশীভূত হয়ে যে পীর সাহেবের কলব উন্মুক্ত । তিনি যা বুঝেন, আমরা তা বুঝিনা । অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে তার নির্দেশ পালন করে যেতে হবে ।

(১৭) পীর বা অন্য কোন ওলীর নিকট তাওবা করা ।

(১৮) পীরের দরবারের নামে খানকা খোলা এবং ভক্তকূলের মানতী হাদীয়া-তোহফা গ্রহণ পূর্বক বিনা মূলধনে ব্যবসা চালিয়ে মানুষের মাল বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করা ।

(১৯) পীরের বাতলানো ছয় লতীফা বা বিশেষ পদ্ধতিতে যিকির করা । এ ছাড়া পীরদের বা তথাকথিত বুজর্গদের বাতলানো দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত যাবতীয় কার্যাবলী যা রাসূল (সাঃ), সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এর যুগে ছিলনা, বিদআতেররূপে গণ্য হবে ।

অতএব, সকল ঈমানদারদের জন্য এগুলো বর্জন করা অপরিহার্য ।

ZvInx` AvKx`v I Avjvni AvBb cÖ‡bZv wkiKi we`AvZ t

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক ও অদ্বিতীয় । ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র তিনি । তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলীর দিক থেকেও তিনি অনন্য, শরীকহীন । রুবুবিয়্যাত, উলুহিয়্যাত এবং নাম ও গুণাবলীর দিক থেকে তাকে যথোপযুক্তভাবে এক সাব্যস্ত করাই তাওহীদের মূল কথা । করতে হবে একমাত্র তাঁর ইবাদত, আনুগত্য ও চলবে একমাত্র তাঁর । শুধু তাঁর হুকুম অনুযায়ী তাঁর দেয়া বিধান মতে শাসন চলবে । যাবতীয় আমলের ক্ষেত্রে কেবল তাঁর সন্তুষ্টিই উর্ধ্বে । তাকেই শুধু ভালবাসতে হবে, ভয় করতে হবে । তাওয়াক্কুলও হবে একমাত্র তাঁর উপর । তিনিই রাজাধিরাজ । কল্যাণ-অকল্যাণের চাবিকাঠি একমাত্র তাঁর হাতে । কিন্তু কোন মানুষ যদি এ সমস্ত বিষয়ে গাইরুল্লাহকে আল্লাহর সমকক্ষ বা সমতূল্য মনে করে তাহলেই সে তার সাথে শরীক করলো এবং এ আকীদা ও কাজ শরীয়ত বিরোধী নব-আবিষ্কৃত হওয়ায় বিদআতরূপে গন্য হবে ।

ivRbxwZ bv Kivi we`AvZ t

রাজনীতি পরিত্যাগ করে তার সাথে কোনরূপ সম্পর্ক না রেখে চলা আরেক প্রকারের বড় বিদআত । যা বর্তমান মুসলিম সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে গ্রাস করেছে । সুন্নত ও বিদআতের গ্রন্থকার মাওঃ আবদুর রহীম বলেন ঃ “রাসূল (সাঃ) রাজনীতি করেছেন । রাষ্ট্রের সাথে তার কাজের সংঘর্ষ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সব বাতিল রাষ্ট্র ও গায়রে ইসলামী রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে পুরাপুরি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন । সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইসলামী আদর্শের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা । রাসূলের

জীবদ্দশায় এবং তার পরে এ রাজনীতি সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, রাষ্ট্র চালিয়েছেন এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনরা ও রাজনীতি করেছেন। রাজনীতির কথা কোরআন মাজীদে রয়েছে, রয়েছে হাদীসে, আছে এ দু'য়ের ভিত্তিতে তৈরী ফিক্হ শাস্ত্রের মাসলা-মাসায়েলে। কাজেই রাজনীতি করা সুন্নত, ইসলামী আদর্শের সাথে পুরাপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। (পৃষ্ঠা-১০২)

অতএব, এ সুন্নতের বিপরীত কোন মত প্রকাশ করাই বিদআত। আর এ বিদআতটি আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে বেশী প্রচলিত। তাঁরা মনে করেন ইসলামে রাজনীতি নেই। তাদের মুখ দিয়ে একটি কথা বার বার উচ্চারিত হয়, ধর্মের নামে রাজনীতি করা চলবেনা। আসলে আমাদের ভাইয়েরা রাজনীতি শব্দের অর্থটিই অনুধাবন করতে পারেননি। রাজ শব্দের অর্থ হচ্ছে সবার সেরা, সবার উপরে, সবচেয়ে মর্যাদাবান। পরিবারের মধ্যে সেরা হচ্ছে রাজপরিবার, মুকুটের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত হচ্ছে রাজমুকুট। পথের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান হচ্ছে রাজপথ। একেবারে বড় হাঁসগুলোকে বলা হয় রাঁজহাস। ঠিক তেমনি যে নীতি সবার উপরে সেটিই হচ্ছে রাজনীতি। আমি জিজ্ঞাসা করি সমগ্র বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দেয়া নীতি তথা আল-কোরআন ও আল-হাদীসের নীতির উপর পৃথিবীর অন্যকোন নীতি কি প্রাধান্য পেতে পারে? একে পরিহার করার কোন সুযোগ কি কল্পনা করা যায়? কখনও না। অতএব ইসলামে রাজনীতি নেই এমন ধারণা বেদআতী ধারনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

কবর যিয়ারত ও মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিদআতসমূহ ঃ

ইসলামে কবর যিয়ারত করা জায়েজ ও সুন্নাত সমর্থীত। ইসলামের শুরুর দিকে তা নিষেধ থাকলেও পরবর্তীতে অনুমতি দেয়া হয়। রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألافزورو ها، فانها تذكر الموت-

"আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারতে নিষেধ করে ছিলাম। তোমরা এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। কারণ, এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে কবর- বিশেষ করে পীর ওলীদের কবরকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ বিদআত ও সুস্পষ্ট শির্ক। নিম্নে এর কতিপয় নমুনা তুলে ধরা হলো।

(১) কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ, সেখানে আল্লাহর ইবাদত করা, শালু কাপড় দ্বারা কবর ঢেকে রাখা, চুনকাম করা, বাতি জ্বালানো, সুগন্ধি ছড়ানো, কবরকে পাকা-পোক্ত করা, শক্ত করে বানানো, তার উপর গম্বুজ বা কোন নির্মাণ কাজ করা, কবরের উপর বসা কোন কিছু লেখা,কবরকে স্পর্শ করা, চুমু খাওয়া, তাওয়াফ করা সম্পূর্ণ বিদআত ও শির্কের অন্তর্ভূক্ত।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ তায়ালা আপনাদের যাদেরকে পবিত্র মক্কা-মদীনায় যাবার তাওফীক দিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, প্রিয় নবীর স্ত্রীরা,মেয়ে ফাতেমাসহ অসংখ্য সাহাবী মদীনায় জান্নাতুল বাকীতে, আর মক্কায় জান্নাতুল মায়াল্লায় চির নিদ্রায় শায়িত আছেন। কিন্তু তাদের কবরগুলো কি পাকা করা হয়েছে? শালু কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে? নিমপ্লেট লাগানো হয়েছে? চুনকাম করা, বাতি জ্বালানো, সুগন্ধি ছড়ানোসহ আমাদের দেশের মাজারগুলোতে যা করা হচ্ছে, এগুলোর কোন কিছুই কি

সেখানে আছে ? না নেই। কারণ, এগুলো বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। তাই সাহাবারা করেননি। রাসূল ও এগুলো করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমাদের কেও এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে।

(২) এমনিভাবে সেখানে দানবাক্স স্থাপন, উরস করা, নারী-পুরষের সংমিশ্রণে বিভিন্ন কাওয়ালী বা গানবাদ্যের আসর জমানো। কবর ওয়ালার উদ্দেশ্যে গরু, ছাগল জবাই করে খাওয়া-খাওয়ানো।

(৩) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চারদিন বা চল্লিশা করা।

(৪) গোসল দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত মৃত ব্যক্তিকে সামনে নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা। এবং গোসলের সময় তার নাকের ভিতরে তুলা প্রবেশ করানো।

(৫) মরনোন্মুখ ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করা। এবং তাকে কেবলা মুখী করে দেয়া।

(৬) জানাজা উপস্থিত হওয়ার পরও দেরী করানো। অর্থাৎ সুন্নাত তারবীহ ও সম্মিলিত দোয়ার পর নামায আদায় করা, এবং দাফনে দেরী করা। অথচ নিয়ম হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত দাফন করে ফেলা। তবে হ্যাঁ, ফরজ নামাযের সময় জানাযা উপস্থিত হলে প্রথমে ফরজ নামায পড়ে নেবে, এরপর জানাযা পড়বে। কারণ, জানাযা হচ্ছে ফরজে কেফায়া আর নামায ফরজে আঈন।

(৭) কবরে মাটি দেয়ার সময় আমাদের দেশে-

منها خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى-

কোরানের এ আয়াতে কারীমাটি যে হাদীসের ভিত্তিতে পড়া হয়। নাসেরুদ্দীন আলবানী বলেছেন ঃ সে হাদীসটি খুবই দূর্বল অথবা জাল। অতএব উত্তম হচ্ছে এগুলো না পড়া।

(৮) জানাযার সাথে সদকা নিয়ে বের হওয়া এবং গরীবদের মাঝে তা বন্টন করা। সদকা শরীয়ত সম্মত পূণ্য একটি কাজ। কিন্তু লাশ নিয়ে বের হবার সময় দান করার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই। মৃতের পরিবার যে কোন সময়েই এ পূণ্য কাজটি করতে পারেন। কিন্তু লাশের সাথে চাল বা অন্য কিছু নিয়ে বের হওয়া এবং দাফন কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে সেখানে তা বন্টন করাকে সাওয়াব মনে করা সুন্নাতের পরিপন্থী।

(৯) কবরের নিকট দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করাকে ওলামাদের অনেকেই বিদআত বলেছেন। কারণ, প্রথমতঃ রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাদের থেকে এটি প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়তঃ এতে কবর যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। আর সেটি হচ্ছে উপদেশ গ্রহণ করা। কবরবাসীদের অবস্থা স্মরণ করে নিজের পরিণতির কথা ভেবে সংশোধন হয়ে যাওয়া। একাজটি যখন বিদআত সুতরাং কবরের পাশে মোসহাফ রেখে দেয়াও বিদআত।

(১০) মহিলাদের ঘন ঘন কবর যিয়ারত করা।

(১১) কবরে ফুল দেয়া, শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ ও তাতে বিভিন্ন উৎসবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করা।

(১২)প্রতি বছর বিশেষ ব্যক্তিদের মৃত্যু দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখা।

(১৩) কবরওয়ালার কাছে কিছু চাওয়া সবচেয়ে বড় বিদআত ও শির্ক।

(১৪) কবরকে কেন্দ্র করে সেখানে ওরসের ব্যবস্থা করা। এ বিদআতটি আমাদের দেশে বেশী প্রচলিত। বিভিন্ন মাজারে গরু-ছাগল মান্নত করে ট্রাক ভর্তি করে সেখানে নিয়ে গিয়ে কবরওয়ালার খুশীর উদ্দেশ্যে যবাই করে সবাইকে নিয়ে তাবারকের নামে খাওয়ানো হয়। এ জাতীয় যবাই হালাল নহে। কবর কেন্দ্রিক গড়ে উঠা মসজিদে নামায পড়া উচিৎ নয়।

(১৫) বিভিন্ন বরকতময় রজনীতে কবরের চতুপার্শ্বে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো বড় ধরণের বিদআতের অন্তর্ভূক্ত।

mdi msµvš cPwjZ we`AvZmgn t

(১) কোন নবী, পীর বা ওলির কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত সফর করা। কারণ, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام مسجدى هذا والمسجد الاقصى-

"আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম (কাবাঘর), মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা।"

এতে বুঝা গেল যে এগুলো ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অপর কোন স্থানের জন্য সফর করা যাবেনা।

সুতরাং আজমীর শরীফ ,বাগদাদ শরীফ, দাতাগঞ্জবখশ, শর্ষিনা শরীফ, চরমোনাই শরীফ, বার আউলিয়ার দরগাহ, জাকের মঞ্জিল, শাহজালালের মাজার, মাইজ ভান্ডার আর সুরেশ্বর শরীফ প্রভৃতি মরা পীরের কবর থেকে ফায়েজ নেয়ার উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া, রাসূলের নির্দেশের সম্পূর্ণ খেলাফ। সুন্নতের বিপরীত এক সুস্পষ্ট বিদআত।

(২) দ্বীনের দাওয়াতের জন্য বিভিন্ন রকমের চিল্লা লাগানো।

(৩) নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীকে দাওয়াত না দিয়ে দূর-দূরান্তে দ্বীনের দাওয়াতী কাজে বের হওয়া।

(৪) দ্বীনের দাওয়াতের কাজে সপ্তাহে একদিন, মাসে তিনদিন, বছরে ৪০দিন, সারাজীবনে ১২০ দিন সময় নির্দিষ্ট করে চিল্লা লাগানো।

এগুলো বিদআত হবার কারণ হচ্ছে ঃ রাসূল (সাঃ) ও সাহাবারা দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ জাতীয় দৈনিক-সাপ্তাহিক, মাসিক-বাৎসরিক ও আজীবনের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারন করেননি। আমরা কেন নতুন করে তা করতে যাব ?

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

أُدْعُ اِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-

"আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে আহবান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা ও সদুপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

لاَيُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا-

"আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কাউকে কষ্ট দেন না।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৬)

فَاتَّقُوْا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ-

"তোমরা যথা সাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।" (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

এ আয়াত গুলোর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সাধ্যানুসারে হিকমতের সাথে উপযুক্ত সময়ে দাওয়াতের কাজ করা উচিত। এক্ষেত্রে বাধা-ধরা কোন সময় চাপিয়ে দেয়া হয়নি। সর্বোপরি রাসূল (সাঃ) থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। তাই এটি বিদআত।

(৫) নিজের স্ত্রী এবং পরিবার পরিজনের ভরন পোষণ ও অন্যান্য অধিকারের দিকে খেয়াল না রেখে খালি হাতে তাদেরকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে দ্বীনের কাজের নামে মাসকে মাস, বছরকে বছর দূরে থাকা বিদআত। রাসূল (সাঃ) এমনটি করেননি। এমনকি যুদ্ধে যাবার সময়ও তিনি লটারীর মাধ্যমে বাছাই করে স্ত্রীকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছেন। অতএব সকল বিষয়ে রাসূলের সুন্নতকেই আঁকড়ে ধরে নিজকে বিদআতমুক্ত রাখতে হবে।

নামাজকে কেন্দ করে প্রচলিত বিদআতসমূহ ঃ

(১) জায়নামাজে দাঁড়িয়ে তথাকথিত জায়নামাজের দোয়া-

انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين

পাঠ করা। কারণ জায়নামাজের কোন দোয়া নেই। আর انى وجهت তাকবীরে তাহরীমার পর সূরা ফাতেহার পূর্বে পঠিতব্য ছানা বা দোয়া সমূহের একটি হিসেবে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

(২) 'নাওয়াইতু আন' বলে নামাজের নিয়ত করা সহীহ হাদীস তো দূরের কথা কোন জঈফ হাদীসেও এটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বানানো শব্দগুলো পড়তে গিয়ে কত মুসল্লীর যে রাকাত ছুটে যায় তার কোন হিসেব নেই। আর শুদ্ধ করে পড়তে পারেই বা কজন?

(৩) শরীর সুস্থ থাকা সত্ত্বেও সুন্নত বা নফল নামাজ বসে পড়া। বিশেষ করে মাগরিবের পর দুই রাকায়াত নফল।

(৪) সালাতুল আওয়াবীন নামে মাগরিবের পর ৬ রাকাত নামাজ পড়া।

(৫) জুমার খোৎবা বা আলোচনার সময় লালবাতি জালিয়ে রাখা এবং একথা লিখে রাখা যে, লাল বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় নামাজ পড়া নিষেধ।

কারণ, সূর্যোদয়, সুর্যাস্ত এবং ঠিক দুপুরের নির্দিষ্ট একটা সময় ছাড়া সাধারনতঃ আর কোন নিষিদ্ধ সময় নেই। অতএব লালবাতি জ্বালিয়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করা বিদআত ছাড়া আর কিছু নয়।

(৬) ইহরামের নামে দু'রাকাত নামাজ পড়তে হবে বলে মনে করা। তবে যদি কেউ ফরজ অথবা নফল নামাজের পর ইহরাম বাঁধে তাতে কোন দোষ নেই।

(৭) নামাজের সালাম ফেরানোর সাথে সাথে ডান হাত ডান কপালে লাগিয়ে (ياقوى) ১১বার পড়া।

(৮) সালাম ফেরানোর সাথে সাথে سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير- পড়া। ফজর এবং আসর ছাড়া বাকী নামাজ গুলোতে ইমাম সাহেব মুসল্লিদের দিকে কিংবা ডান বা বাম দিকে মুখ করে না বসা, প্রিয় নবী (সাঃ) একাজটি করতেন।

(৯) সালাম ফিরানোর পর রাসূল (সাঃ) যতটুকু বলেছেন ততটুক না বলে নিজের থেকে বাড়িয়ে এভাবে বলা সুন্নতের পরিপন্থী-

اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت ياذالجلال والاكرام-

(১০) সুন্নত নামাজ পড়ার জন্য জায়গা পরিবর্তন আবশ্যক মনে করা।

(১১) সালাম ফেরানোর পর সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নিজের ডান ও বামের মুসল্লীর সাথে মোসাফাহা করা। আর ঈদের নামাযের শেষ হওয়ার সাথে সাথে ঈদের মাঠে পরস্পরে করমর্দন ও কোলাকুলীর লাইন লাগিয়ে দেয়া।

(১২) জুমার দিন খোৎবা চলাকালীন দানবাক্স চালানো।

(১৩) জুমার খুৎবার পূর্বে স্থানীয় ভাষায় ওয়াজ নসীহত পেশ করার পর মিম্বরে উঠে আরবীতে মূল খুৎবা পেশ করা। এতে খুৎবা হয়ে যায় তিনটি। অনারবী ভাষায় জুমার খুৎবা দেয়া যাবেনা মনে করেই মূলতঃ এ বিদআতটি করা হয়। আসলে খুৎবার আরকান ঠিক রেখে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াটাই উত্তম। সৌদী আরব সহ বিশ্বের বড় বড় আলেমগণ এ ফতোয়া দিয়েছেন এবং এর উপর আমল ও হচ্ছে। আমাদের দেশে ও কোন কোন মসজিদে এ আমল চালু আছে। এটিই সঠিক বলে আমরা মনে করি।

(১৪) রমযানের শেষ জুমাকে جمعة الوداع নামে আখ্যায়িত করা।

(১৫) জানাযার নামাজ শেষে হাত তুলে দোয়া করা।

(১৬) ফরজ নামাজের সালাম ফিরিয়ে দায়েমীভাবে ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে মুসল্লীদের সম্মিলিত ভাবে মুনাজাতে অংশগ্রহণ করা।

রাসূল (সাঃ) দশ বৎসর মদীনায় কাটিয়েছেন। তিনিই ইমামতি করেছেন। একটি সহীহ হাদীস ও এমর্মে পাওয়া যাবেনা যে-রাসূল সালাম ফিরিয়ে সবাইকে নিয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করেছেন। এজন্যই পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম যেমন ঃ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাহঃ), আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রাহঃ), পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মদ শফী (রাহঃ), এবং বাংলাদেশের মুফতীয়ে আযম হাটহাযারী মাদ্‌রাসার হযরত মাওলানা ফায়জুল্লাহ সাহেব (রাহঃ) সহ অসংখ্য আলেম এটাকে বিদআত বলেছেন। পবিত্র মক্কা শরীফ, মদীনা মুনাওয়ারাহ, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা সহ কোন আরব রাষ্ট্রেই সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত ভাবে মোনাজাত দেয়া হয়না। কোন কোন ভাই বলে থাকেন ঃ এমনিতে দোয়া ভাল জিনিস আর কোন নিষেধতো নেই, অতএব করতে দোষ কি?

আমরা বলব ঃ রাসূল (সাঃ) এভাবে করেছেন কিনা? না করে থাকলে আমাদের করাটা বিদআত হবে। সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাতের কথাই কেবল আমরা বিদআত বলছি। সালাম ফিরায়ে রাসূল (সাঃ) যে সকল যিকর, তাসবীহ ও দোয়া পড়েছেন, সেগুলোতো আমাদেরকে ও পড়তে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সেটা না করে নতুন নতুন পদ্ধতি ও কাজ আবিষ্কার করে আমল করে যাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ সুন্নতের উপর আমল করার তাওফীক দিন।

diR bvgv‡hi mvjvg †div‡bvi ci ivmj (mvt)
†h t`vqv¸‡jv co‡Zbt

প্রিয় পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে এর কয়েকটি তুলে ধরা হলো ঃ

📖 হযরত ছাউবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন ৩বার استغفر الله বলতেন। এরপর اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذالجلال والاكرام

এই দোয়াটি পড়তেন। (মুসলিম)।

📖 বোখারী এবং মুসলিম শরীফে এসেছে ঃ মুগীরাহ ইবনে শো'বা মোয়াবীয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের নিকট লিখেছেন যে, রাসূল (সাঃ) যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন-

لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لامانع لمااعطيت ولا معطى لمامنعت ولاينفع ذاالجد منك الجد-

📖 মুসলিম শরীফে এসেছে ঃ আবদুল্লাহ বিন যোবাইর (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের সালাম ফিরানোর পর বলতেন ঃ

لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لاحول ولا قوة الا بالله، لااله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناءالحسن، لااله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون-

তিনি বলেছেন যে রাসূল (সাঃ) প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়াটি পড়তেন।

📖 আবু দাউদ নাসায়ী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত মোয়াজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সাঃ) একদিন আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, হে মোয়াজ, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি! আমি তোমাকে ভালবাসি। হে মোয়াজ প্রত্যেক নামাযের পর এ দোয়াটি পড়া কখনো ছেড়ে দেবেনা।

اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك-

📖 এরপর প্রিয় নবী থেকে বর্ণিত বিভিন্ন তাসবীহ আদায় করবে। যার মধ্যে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হচ্ছে এরকম, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর سبحان الله ৩৩ বার, الحمد لله ৩৩ বার, الله اكبر ৩৩ বার বলে لااله الا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير- বলে একশত পূর্ণ করবে, সমুদ্রের ফেনা সমপরিমান হলেও তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। (মুসলিম)

📖 এরপর ، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد এবং قل اعوذبرب الناس সুরা গুলো পড়া মোস্তাহাব। যেমনটি আবু দাউদ এবং নাসায়ী গ্রন্থে উবাই ইবনে আমের থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূল (সাঃ) প্রত্যেক নামাযের পর এগুলো পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

📖 এছাড়া প্রত্যেক নামাযের পর آية الكرسى পড়ার সাওয়াব হাদীসে এভাবে এসেছে, হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর اية الكرسى পড়বে, তার মাঝে আর জান্নাতের প্রবেশ করার মাঝে মৃত্যুই কেবল বাধা হয়ে থাকবে। (নাসায়ী) অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের খেদমতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করব, ফরজ নামাযের পর এ জাতীয় দোয়া গুলো আমলে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন।

(১৭) পাগড়ী পরে নামাজ পড়লে অনেক সাওয়াব হবে মনে করা। এজন্যই অনেক মসজিদে দেখা যায় যে অন্য সময় পাগড়ীটা মেহরাবের কাছে অযত্নে পড়ে থাকে, শুধুমাত্র ফরজ নামাজের ইকামত দিলেই ইমাম সাহেব পাগড়ী বাঁধতে শুরু করেন। আবার নামাজ ও শেষ পাগড়ীর কাজ ও শেষ। তাদের এ আচরণে মনে হচ্ছে-নামাজ পড়ার সাথেই যেন পাগড়ীর সম্পর্ক।

gjZt ব্যাপারটি এরকম নয়। রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবারা সবসময় পাগড়ী পরতেন। অতএব সুন্নত হিসেবে সবসময়ই পরা উচিত, শুধু নামাযের সময় নয়।

পাগড়ীকে কেন্দ্র করে আরো একটি বিষয় বলাবলি হচ্ছে যে, মুক্তাদির পাগড়ী থাকলে আর ইমাম সাহেবের না থাকলে মনে হয় যেন তার ইমামতিতে অনেকের তৃপ্তি হচ্ছে না। এ জাতীয় ধারণা পোষণ করা থেকে ও আমাদের বিরত থাকতে হবে।

(১৮) ইকামতের সময় মোয়াজ্জিনের قد قامت الصلاة বলার পর নামাযের জন্য দাঁড়ানোর নিয়ম চালু করা। কোন কোন ইমাম সাহেবের قد قامت الصلاة বলার সাথে সাথে تكبير تحريمة বাঁধা।

‡`vqv, wh‌Ki, †KviAvb †ZjvIqvZ I LZg co‡bv msµvšÍ we`AvZ t

সবাইকে ডেকে নির্দিষ্ট দিন,সপ্তাহ, মাস বা বছরে একত্রিত হয়ে সমস্বরে চিৎকার হই হল্লোড় করে অস্বাভাবিক আওয়াজে দোয়া বা যিকরের আয়োজন করা সুন্নতের পরিপন্থী ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لايحب المعتدين-

“তোমাদের রবকে কাতর ভাবে চুপে চুপে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না । (সূরা আরাফ ঃ ৫৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন ঃ

واذكرربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو الاصال ولا تكن من الغافلين-

“হে রাসূল সকাল ও সন্ধ্যায় মনে মনে কাতর ভাবে ও ভয়ের সাথে আপনার রবের যিক্‌র করুন এবং নিচু আওয়াজে মুখোমুখেও যিকির করুন । আর আপনি গাফিলদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবেন না । (সুরা আরাফ ঃ ২০৫)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নীচু স্বরে কাতর কণ্ঠে চুপে চুপে সংগোপনে আল্লাহর যিক্‌র এবং দোয়া করা বাঞ্চনীয় ।

(১) দোয়া করার সময় তিনবার ইস্তেগফার, ১১বার দরূদ শরীফ, ৩বার সুরায়ে ইখলাস পাঠ করে দোয়া শুরু করার নিয়ম করে নেয়া ।

(২) واجعل اخر كلمتنا عند الموت لااله الا الله বলে দোয়া শেষ করতে হবে বলে মনে করা ।

(৩) দোয়া শেষ করে দুইহাত দিয়ে মুখ মোছাকে জরুরী মনে করা ।

(৪) আযানের শেষে দু’হাত তুলে দোয়া করা । একটি বিষয় আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে, রাসূল (সাঃ) যেখানে যেখানে দোয়ার সময় হাত উঠিয়েছেন আমরা ও সেখানে উঠাব । আযানের পর হাত তোলা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে ।

(৫) বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খতমে ইউনুস, খতমে তাহলীল, খতমে খাজেগান, খতমে শেফা পড়া ।

(৬) বরকতের জন্য সবিনা খতম পড়ানো ।

(৭) রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত দোয়া গুলো না পড়ে অন্যান্য মানুষের বানানো দোয়া ও যিক্‌র আমল করা ।

(৮) সওয়াবের উদ্দেশ্যে দালাইলুল খায়রাত পাঠ করা ।

(৯) তাসবীহ-তাহলীল পড়ার জন্য পাথর কণা বা অন্য কিছু একত্রিত করে দলবদ্ধভাবে একে অন্যের মাঝে দেয়া নেয়া করা ।

(১০) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কোরআন চুমু খাওয়া, বুকে ও কপালে লাগানো ।

(১১) কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সর্বদা সভা সমিতি আরম্ভ করা উচিৎ এমনটি মনে করা ।

(১২) কোরআন তেলাওয়াত শেষে সাদাকাল্লাহুল আযীম বলা জরুরী মনে করা ।

(১৩) তিলাওয়াত শুনার সময় হঠাৎ বিনা কারণে ডুকরে কেঁদে উঠা ।

(১৪) সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে ১০ খতম কোরআনের সাওয়াব পাওয়া যায় বলে মনে করা।

(১৫) খানার উপর বরকতের জন্য সূরা কুরাইশ পড়া।

(১৬) দোয়া করার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা জরুরী মনে করা।

(১৭) যিক্‌রের ক্ষেত্রে নিজেদের বানানো যিক্‌র সমূহের দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যিক্‌র করা। যেমন ঃ শুধু আল্লাহ-আল্লাহ, ইয়াহু-ইয়াহু, ইল্লাল্লাহ-ইল্লাল্লাহ, হু-হু এবং আল্লা বলে হু লম্বা করে টেনে দলবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে যিক্‌র করা।

(১৮) আল্লাহ শব্দের সাথে তাঁর কোন গুনবাচক শব্দ যোগ না করে যিক্‌র করা। এটি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। আমরা কেন পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে যিক্‌র করিনা।

যেমন ঃ سبحان الله – الحمد لله - الله اكبر ولا اله الا الله অথবা শুধু لا اله الا الله যাকে রাসূল (সাঃ) افضل الذكر তথা সর্বোৎকৃষ্ট যিক্‌র বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(১৯) মা-ফী কালবী গায়রুল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু বলে বলে যিক্‌র করা।

(২০) বিশেষ বিশেষ দিনে মসজিদে বাতি বন্ধ করে দিয়ে দলবদ্ধভাবে উচ্চঃস্বরে জাতীয় যিক্‌রের মহড়া চালানো।

wcq fvB I tev‡biv!

যেহেতু এ জাতীয় যিক্‌র, দোয়া ও তেলাওয়াতের কোনটিই উল্লেখিত পদ্ধতিতে রাসূল (সাঃ) সাহাবা, তাবেয়ীন কারো থেকে প্রমাণিত নয়, তাই নিঃসন্দেহে এগুলো বিদআত। দোয়া যিক্‌র তেলাওয়াত সহ সব ধরণের আমলের ক্ষেত্রেই প্রিয় নবীর সুন্নাতকেই অনুসরণ করতে হবে। দোয়ার ক্ষেত্রে রাসূলের সুন্নাত হলো তিনি সব সময় অল্প কথায় বেশী অর্থ প্রদানকারী দোয়াগুলো পড়তেন। আর অন্য গুলো ছেড়ে দিতেন।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে রাসূলের কথার চেয়ে অন্য কারো কথা উত্তম হতে পারেনা। বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল থেকে বর্ণিত অসংখ্য দোয়া রয়েছে। আমাদেরকে সব সময় এগুলো আমলে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে অল্প মেহনতে আমরা অনেক সাওয়াব লাভ করতে পারব। পক্ষান্তরে মানুষের বানানো গুলোকেই যদি ধরে রাখি তাহলে প্রথমত রাসূলের বাতলানো দোয়া গুলোর প্রতি অবহেলা প্রদর্শিত হলো। দ্বিতীয়ত অন্যদের বানানো কথা বা দোয়ার মধ্যে শেরকী কথাবার্তা সম্ভাবনা ও থেকে গেল। আমরা যদি শুধু রাসূল থেকে বর্ণিত দোয়াগুলো প্রত্যেহ জীবনে পড়তে যাই তাহলে সেগুলোই শেষ করতে পারবনা। অন্যের গুলো পড়ার সুযোগ কোথায়? এজন্য আসুন বেশী বেশী রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণিত দোয়া গুলো পড়ে পড়ে ইবাদতের স্বাদ আস্বাদন করি।

পবিত্রতা অর্জন সংক্রান্ত বিদআত ঃ

(১) অযু করার সময় গর্দান মাসেহ করা ।

(২) ইস্তেনজার সময় পানির সাথে ঢিলা-কুলুখ নেয়া ওয়াজিব মনে করা ।

(৩) প্রসাবের পর ঢিলা লাগিয়ে ৪০ কদম হাঁটা, গলা খাকারী দেয়া, অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে প্রসাব বের করা চেষ্টা করা । এ জাতীয় আচরণ সর্বসমক্ষে লজ্জাস্কর ও বটে । আমাদের প্রশ্নঃ আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে এ জাতীয় আচরণ কি প্রমাণিত?

(৪) অযুতে প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় কতগুলো নির্দিষ্ট দোয়া পড়া ।

(৫) খাবার আগে অযু করলে দারিদ্রতা দূর হয়, এমন ধারণা করা ।

(৬) নাপাক কাপড় সাতবার না ধুলে পাক হবেনা বলে মনে করা । (শুধু কুকুরের লালা থাকলে একবার মাটি দিয়ে রগড়ে পরে সাতবার পানি দিয়ে ধুতে হবে । অন্যান্য সব ক্ষেত্রে তিনবার শুধু পানি দ্বারা ধুলেই যথেষ্ট হবে ।

হজ্জ ও ওমরা সংক্রান্ত বিদআত ঃ

(১) প্রত্যেক তাওয়াফ বা সায়ীতে নির্দিষ্ট দোয়া পড়া ।

(২) মক্কা, মদীনা, আরাফাহ-এধরণের জায়গার মাটি, গাছ, পাথর ইত্যাদি বরকত স্বরুপ অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া ।

(৩) হজ্জ বা ওমরার সময় ছাড়া অন্য সময় মাথা কামানো সুন্নত মনে করা ।

(৪) আরাফার বিশ্ব ইজতেমার সাথে অন্যান্য দেশের কোন বিশ্ব ইজতেমাকে তুলনা করা । টাকা-পয়সা খরচ করে শামিল হয়ে আরাফার মত সাওয়াবের আশা করা ।

(৫) এ দেশের টঙ্গীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইজতেমাকে গরীবদের হজ্জ বলে মনে করা ।

(৬) ইজতেমার তিনদিন বিশেষ সাওয়াবের আশায় রোজা রাখা বড় বিদআতগুলির অন্যতম ।

(৭) হজ্জ করে নিজের নামের সাথে আলহাজ্ব উপাধি লাগানো । একবার হজ্জ করার কারণে যদি আলহাজ্ব লাগাতে হয় তাহলে দৈনিক ৫বার যিনি নামায পড়েন তিনি বলবেন মুসল্লি অমুক ।

(৮) ইহরামের কাপড় দ্বারা মৃত্যুর পর কাফন দিলে বিশেষ মর্যাদা লাভের আকীদা পোষণ করা ।

(৯) হজ্জ করতে গিয়ে হেরা গুহা বা গারে সাউরে উঠাকে ইবাদত মনে করা ।

(১০) হজ্জের সময় বেশী বেশী ওমরা আদায় করাকে অধিক সাওয়াবের কাজ মনে করা । রাসূল (সাঃ) ও সাহাবারা এমনটি করেননি । বরং বেশী বেশী নফল তাওয়াফের ব্যাপারে হাদীসে অনেক ফজিলতের কথা এসেছে ।

(১১) ছেলে মেয়ের বিবাহ-শাদী সম্পন্ন করার পরেই হজ্জ করা উচিত এমন ধারণা পোষণ করা ।

(১২) রোকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করতে না পারলে হাত দিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু খাওয়া সুন্নাতের পরিপন্থী ।

বিবাহ-শাদী সংক্রান্ত কতিপয় বিদআত ঃ

(১) কণেকে দেখার জন্য যিনি বিবাহ করবেন তিনি ছাড়াও অন্যান্য গায়রে মাহরামরা ঘটা করে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে দেখা ।

(২) উভয় পক্ষে যুবতী মেয়েদের কে দিয়ে বর কণের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করা । এটি ইসলামী শরীয়তে হারাম ও বটে ।

(৩) বিবাহ বার্ষিকী পালন করা । এটি পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে ।

(৪) তালাকের বাগডোর স্ত্রীর হাতে দেয়া । এটি কোরআন হাদীসের পরিপন্থী । কারণ, মহিলারা আবেগপ্রবণ । সামান্য কারণেই তালাক দিয়ে বসতে পারে । এজন্য শরীয়ত এ বিষয়টি পুরুষদের হাতে ন্যস্ত করেছে ।

(৫) বিবাহের সময় তালাকের ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে অর্পণের শর্ত করা । যেমনটি আমাদের দেশের বৈবাহিক আইনে রয়েছে ।

(৬) ঋতুকালে বা পবিত্রতার পিরিয়ড যাচাই না করে একই মজলিসে একসাথে স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়া সুন্নাতের পরিপন্থী ।

(৭) প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করতে না পারার বিধান যা আমাদের দেশের বৈবাহিক আইনে বিদ্যমান আছে তা সুন্নাত সমর্থিত নহে ।

আরো কতিপয় বিদআতের বর্ণনা ঃ

☒ পীর বা ওলী-আল্লাহদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষন করা যে, তাদের অলৌকিক কার্যাদী সাধনের ক্ষমতা রয়েছে । বিশেষ করে মৃত্যুর পর তাদের রুহানী তাছাররূপের ক্ষমতা আরো বেড়ে যায় । এজাতীয় আকীদা সুস্পষ্ট শিরক ও বিদআত ।

☒ বিশেষ ব্যক্তির কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা আর কবর ওয়ালার কাছে চাওয়া বড় শিরকের অন্তর্ভূক্ত ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

ومن أضل ممن يدعو من دون الله لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غفلون-

" ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর পথভ্রষ্ট আর কে যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন লোককে ডাকে যে কেয়ামত পযর্ন্ত ও ডাকে সাড়া দিতে পারবেনা । (কিভাবে সাড়া দেবে) তারা তো ওদের ডাকের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর । (সূরা আহকাফ -৫)

☒ তাবিজ তুমার ও কবজ বাঁধা শির্ক-বিদআতের অন্তর্ভূক্ত । এমনিভাবে কোরআন এবং হাদীসের বাণী ছাড়া অন্য কোন কথা বা জিনিসের দ্বারা ঝাড়ফুঁক ও বিদআত ।

☒ ইসলামে সুন্নতী পোশাক বলতে বিশেষ ছাঁট বা ডিজাইন এবং বিশেষ সাইজের লম্বা/খাটো জামাকে বুঝানো ।

কারণ, ইসলামে পোশাকের ব্যাপারে যে মূলনীতি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা হলো-

১. লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে ।

২. সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালীনতা, রুচি এবং সুস্থতার পরিচায়ক হবে ।

৩. কুরুচীপূর্ণ এবং নির্লজ্জতা প্রকাশকারী হবেনা । সাথে সাথে বাহুল্য খরচ, অহংকার ও বাহাদুরী প্রকাশক হতে পারবেনা । পুরুষদের পোশাক মহিলাদের পোশাকের সাথে আর মহিলাদের পোশাক পুরুষদের পোশাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারবেনা । যে কোন পোষাকে উপরোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকলে সেটি কোরআন-হাদীস মোতাবেক পোশাক বলে বিবেচিত হবে ।

অতএব, বিশেষ ধরণের পোশাক যেমন- পায়ের নালার অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা কল্লিদার জামা, পায়জামা বা লুঙ্গীর উপর পরিহিত নিসক সাক জামাকে সুন্নতী লেবাস বলে চালিয়ে দেয়া বড় বিদআত ।

☒ স্বপ্নের ফায়সালা মেনে নিয়ে সে মোতাবেক আমল করা জঘন্য বিদআত । এগুলো সাধারণতঃ পীর সাহেবদের দরবারে হয়ে থাকে । মুরীদরা পীরের প্রিয় ভাজন হওয়ার লক্ষ্যে কত রকমের স্বপ্ন যে দেখে তার ইয়ত্তা নেই । স্বপ্নে হুজুরের বেলায়েত এবং উচ্চ মর্যাদার কথা বললেই তো হুজুর খুশী হবেন ।

‡KD nq‡Zv ejj t আমি অমুক বুজুর্গকে স্বপ্নে দেখেছি । তিনি অমুক কাজ করতে আর অমুক কাজ ছাড়তে বলেছেন । ব্যাস্-তখনি স্বপ্ন মোতাবেক আমল শুরু হয়ে যায় । এমনিভাবে আরেকজন হয়তো বলল ঃ “আমি রাসূল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি এমন করতে বলেছেন । তখন সেটাকে আঁকড়ে ধরা হয় ।

যেহেতু ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে- স্বপ্ন শরীয়তের কোন দলীল হতে পারেনা, কাজেই স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে আমল করা সম্পূর্ণ বিদআত ।

রাসূল (সাঃ) এর জীবদ্দশায়ই আল্লাহ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন । অতএব এগুলোর ধুয়া তুলে লোকদেরকে গোমরাহ করা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায়না ।

☒ পীর-ওলীদেরকে হুজুর কেবলা, হুজুরে পাক, আব্বা হুজুর, বাবা-মাওলানা বলে ডাকা ।

☒ সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সর্বদাই হাতে তাসবীহ রাখা ।

☒ বরকত হাসিল করার জন্য শুধুমাত্র সহীহ বুখারীর হাদীস পাঠ করা ।

☒ খাওয়ার সময় লবন মুখে দিয়ে তার পর খাওয়া আরম্ভ করাকে সুন্নত মনে করা । সাইরেন, কামান, ঢোল, গজলের সুর বাজিয়ে সাহরী ও ইফতারের জন্য ডাকাকে সওয়াব মনে করা এবং চাঁদা নেয়া ।

☒ চার মাযহাবের মধ্যে যে কোন একটি মাযহাবের হুবহু অনুসরণ করাকে ফরজ, ওয়াজিব অথবা সুন্নত মনে করা ।

☒ মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন দল তৈরী করা ।

☒ আরাফার রাত্রিতে নিজ নিজ স্থানে সমাবেশের আয়োজন করা ।

☒ রাতের শেষের দিকে বড় মসজিদে সমবেত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়লে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে, এমন আকীদা পোষন করা ।

☒ আজ এক বাড়ীতে, কাল আরেক বাড়ীতে সমবেত হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা, রাসূলের উপর দরূদ পড়া, নিজের এবং সকল মুসলমানের জন্য দোয়ার সিষ্টেম চালু করা ।

☒ নববর্ষ ও বিশেষ উৎসবে সমবেত হওয়া এং ঐ সকল দিবসে রোজা রাখা ।

☒ মসজিদ বা অন্য কোন জনাকীর্ণ স্থানে সমবেত লোকদের নিয়ে ভিত্তিহীন অবান্তর কিস্‌সা কাহিনীর আসর জমিয়ে ওয়াজ শুনানো। তবে কোরআন হাদীসের সহীহ এবং বিশুদ্ধ কথার দ্বারা অনুপ্রানিত করা ভাল কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে।

☒ মসজিদে সমবেত হয়ে আয়াতে সেজদা তেলাওয়াত করে করে কাঁদা আর সিজদায় গিয়ে দু'হাত উপরে তুলে রাখা।

☒ সূরায়ে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত وكبره تكبيرًا পড়া হলে উচ্চঃস্বরে শ্রোতাদের তাকবীর বলে উঠা।

☒ আল-কোরআনের কোন বিষয়কে নিয়ে ঝগড়া বা বিরোধে লিপ্ত হওয়া।

☒ কোরআনকে গানের সুরে পড়া। বা কাপিয়ে কাপিয়ে পড়া।

☒ মুসল্লীদেরকে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত করানোর উদ্দেশ্যে আজানের পূর্বে বিভিন্ন ধরণের আহবান সম্বলিত গান গজল পরিবেশন করা।

☒ নামাজের প্রত্যেক রাকাতে একাধিকবার সূরা ইখলাস পড়া। এমনিভাবে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে অন্যান্য সূরা না পড়ে বিশেষ কোন সূরা বার বার পড়া।

☒ শাবানের ১৫তম রজনীকে লাইলাতুল কদরের মত পূণ্যবান মনে করা।

☒ বেদাতীদের সাথে উঠাবসা করা, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাদের সম্মান করা, তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া।

☒ জুমার পর জোহরের নামাজ পড়া নিকৃষ্টতম বিদআত।

☒ দোয়া গঞ্জিল আরশ ও অন্যান্য বানানো দোয়াকে প্রত্যেহ ওজীফার মত পাঠ করা।

☒ শরীয়ত অনুমোদন করেনি এমন স্থানকাল পাত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং উৎসব পালন বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়ে ডঃ মোহাম্মদ মোজ্জাম্মেল আলী حفظه الله তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ الاشتقامة على الايمان এর ৩৭০-৩৭৩ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ

নিম্নে বর্ণিত স্থানসমূহ ছাড়া অন্য কোন স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অনুমতি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দেননি। স্থান গুলো হচ্ছে ঃ মাকামে ইব্রাহীম, সাফা-মারওয়া, আরাফা, মোযদালেফা, মিনা, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, বায়তুল মোকাদ্দাস, উল্লেখিত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্যান্য মসজিদ গুলোকে ও আমরা তাজীম করবো। আর সেটি হবে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম। কাল বা সময়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন হজ্জের দিন গুলো, আইয়্যামে তাশরীক, রামাদান মাস, সোমবার, বৃহস্পতিবার, প্রত্যেক সপ্তাহের জুমাবার, আশুরা ও দু'ঈদের দিন সহ এ জাতীয় অন্যান্য দিনের ক্ষেত্রে। এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাতলানো পদ্ধতিকে অতিক্রম করা যাবেনা। কারণ, এগুলো হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত তাওকীফী। দলীল ছাড়া এতে বাড়ানো বা কমানোর কোন সুযোগ নেই। সুতরাং এগুলো বিদআত।

ঈদ বা উৎসব পালনের বিষয়গুলোকে ডঃ মোজ্জামেল তিন ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(ক) স্থানকেন্দ্রিক উৎসব।

(খ) সময়কেন্দ্রিক উৎসব।

(গ) সমাবেশকেন্দ্রিক উৎসব।

(ক) ইসলামী শরীয়তে যার কোন বিশেষত্ব নেই। যেমন ঃ মরুভূমি, বনজঙ্গল এবং অন্যান্য সাধারণ স্থানসমূহ, ইবাদতের উদ্দেশ্যে এসকল স্থানের যিয়ারত বৈধ নহে।

(খ) এমন স্থান যার বিÕklZ i‡q‡Q, wKš' †mLv‡b Bev`‡Zi D‡Ï‡k¨ hvIqv hv‡ebv| †hgb t ivmj (mvt) I Ab¨vb¨‡`i Kei| wbtm‡›`‡n wcq bex I Ab¨vb¨ Ijx‡`i Kei m¤§vwbZ| G¸‡jv‡K m¤§vb Kiv I †ndvRZ Kiv Cgvbx `wqZ| †mLv‡b †cŠQ‡j ivm‡ji Dci mvjvZ I mvjvg †ck Kivi D‡Ï‡k¨, Avi Ab¨vb¨ Keievmxi Rb¨ ¶gv cv_bvi j‡¶¨ Kei wHqviZ Kiv I †gv¯ÍvnveÑ| wKš' Bev`‡Zi D‡Ï‡k¨ Uv‡MU K‡i hvIqv hv‡e bv|

(M) Ggb ¯'vb hv‡K Drme‡ei ¯'vb wn‡m‡e MnY bv K‡i †mLv‡b Bev`Z Kiv hv‡e| †hgb t gmwR‡` †Kvevq bvgvR Av`vq Kiv| wKš' cwZ ermi ev cwZ gv‡m Drm‡ei gZ K‡i wbawiZ mg‡q †mLv‡b hvIqv wVK n‡e bv| kvevb gv‡mi ga¨ iRbxi (k‡eeiv‡Zi) weIqwU I GiKg| Drm‡ei gZ K‡i cwZ eQi Zv cvjb Kiv hv‡e bv|

mgq‡Kw›`K Drm‡ei †¶‡Î I kixq‡Zi wZbwU weavb i‡q‡Q t

(K) Ggb w`b hvi cwZ kixqZ †Kvb ghv`v c`kb K‡iwb| †hgb t iR‡ei 27ZwiL iwÎ, †h iwÎ‡Z ivmj (mvt) Bmiv I †givR wM‡q‡Qb| Hw`b ev iwÎi m¤§v‡b A_ev we‡klI †Kvb Bev`Z Drm‡ei e¨vcv‡i kixq‡Z †Kvb wKQB ewYZ nqwb|

(L) Ggb w`b †h w`‡b HwZnvwmK NUbv N‡U‡Q weavq Gi ghv`v ¸i"Z i‡q‡Q| †hgb t g°v weR‡qi w`b| wKš' H w`b‡K †Kvb Bev`Z ev Drm‡ei Rb¨ Lvm Kiv hv‡ebv|

(M) †h w`‡bi kiqx ghv`v i‡q‡Q| †hgb t Avïiv, Avivdv, Ges `ÕC‡`i w`b| ivm‡ji evZjv‡bv c×wZ‡Z G¸‡jvi cwZ m¤§vb c`kb Kiv n‡e| wKš' mxgv AwZµg Kiv hv‡ebv|

mgv‡ek †Kw›`K Drme‡K I wZb fv‡M fvM Kiv hvq t

(K) hv‡K kixqZ KLbB wewae× K‡iwb| Rb¥-gZ¨ ewlKx cvj‡bi j‡¶¨ mgv‡ek Gi Ašf³|

(L) †h mgv‡e‡ki wb‡`k kixqZ c`vb K‡i‡Q| †hgb t Rgv, C` Ges Rgv‡Z bvgv‡hi mgv‡ek| Ggwb fv‡e IqvR bmxn‡Zi mgv‡ek|

(M) Ggb mgv‡ek hv kixq‡Z nvivg mve¨¯Í Kiv n‡q‡Q| †hgb t Kei ev ¯§wZ‡mŠ‡a bvgvh cov ev Zvi PZi`‡K ZvIqvd Kivi D‡Ï‡k¨ mg‡eZ nIqv|

m¤§vwbZ cvVK cvVKv, fvB I †ev‡biv Wt †gvnv¤§` †gv¾v‡¤§‡ji Dc‡iv³ bxwZ wbaviYx e³e¨ †_‡K we`AvZ‡K †Pbvi A‡bK Dcv`vb Avgiv jvf Ki‡Z cvie e‡j Avkv iwL|

☑ miKvix †emiKvix D‡`¨v‡M nvmcvZvj wbgvY I Ab¨vb¨ cwiKíbv ev¯evq‡bi j‡¶¨ †`ke¨vcx †iwWI, †Uwjwfkb, cÎ-cwÎKvq jUvixi †NvlYv †`qv| GwU miKvwi Rqv Qvov Avi wKQB b‡n| cweÎ †KviAv‡b Avjvn ZvqvjvBikv` K‡ib t

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من علم الشيطان فاجتنبوه-

"নিশ্চয়ই মদ,জুয়া, পূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ধারণের তীর নাপাক শয়তানী কাজ এ সব থেকে দূরে থাক।" (সূরা মায়েদা ঃ ৯০)

m¤§vwbZ fvB I †ev‡biv!

এহচ্ছে ইবাদতের নামে প্রচলিত কতিপয় বিদআতের নমুনা। এর মধ্যে কিছু আছে এমন যা বিদআতীকে মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। আর কিছু আছে এমন যা মিল্লাত থেকে বের না করলে ও বড় ধরণের গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। একজন ঈমানদারের জন্য অতীব জরুরী হচ্ছে সর্বদা ঐ জাতীয় কাজ

সমূহ থেকে বেঁচে থাকা যা তাকে গুনাহগার বানিয়ে দেবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হিফাজত করুন। আমীন।

we`Av‡Zi Kdjmgn t

বিদআতের কুফল সীমাহীন। সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি তুলে ধরা হলো ঃ

c_gZt we`AvZxi †¶‡Î t

১. বিদআতীর কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়না।

২. বিদআতীর উপর থেকে আল্লাহ পাক তাঁর হেফাজতকে উঠিয়ে নিয়ে অপমানিত করে ছাড়েন।

৩. আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়।

৪. দুনিয়াতে অপমান আর পরকালে আল্লাহর গজব তার উপর ঢেলে দেয়া হয়।

৫. রাসূল (সাঃ) এর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক বাকী থাকেনা।

৬. কেয়ামত পর্যন্ত যতজন বিদআতের উপর আমল করবে; বিদআতীর উপর পাপের একটি অংশ চাপানো হবে।

৭. বিদআতীর তওবা নসীব হয়না।

৮.বেঈমান হয়ে মরার আশংকা থাকে।

৯. হাওযে কাউসার থেকে তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হবে।

wØZxqZt a‡gi Dci we`Av‡Zi cfve t

১. সুন্নত লোপ পেতে থাকে।

২. কোরআন- হাদীস পরিত্যক্ত হওয়া শুরু হয়।

ZZxqZt mgv‡R Gi cfve t

১. বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধ সৃষ্টি হতে থাকে।

২. মানুষরা বিভিন্ন বালা মুসীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

gmjgvb fvB I †ev‡biv!

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি বিদআত সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত সমাজ থেকে বিদআত সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হবে ততদিন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলের (সাঃ) আওয়াজ বুলন্দ হবেনা। অতএব আসুন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা বিদআতকে উৎখাত করি ঃ

☑ কোরআন-সুন্নাহ থেকে দলীলের মাধ্যমে বিদআতগুলোকে চিহ্নিত করে এর ভয়াবহতা মানুষের সামনে তুলে ধরি।

☑ হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দেই।

☑ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এর মত মহান কাজের ব্রতী হই।

☑ নাস্তিক, মুরতাদ, বিদআতীদের তৎপরতার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখি এবং তাদের রচনাবলী যেন মুসলমানদের হাতে না পৌঁছায় সে চেষ্টা করি।

☑ উপরন্তু সত্য পথের আহবানকারীদেরকে সাধ্যানুসারে সহযোগিতা করি।

আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দিন। Avgxb।